63

13/6.3

3/6

3/63

6884

সহজিয়া

SENIOR BASIC TRAINING COLLEGE

[কাব্য-উপন্যাস]

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট

মূল্য ১।০

প্রকাশক
শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়
ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট।
১১নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

~~8013~~
6313

কান্তিক প্রেস
২২, সুকিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
শ্রীকালাচাঁদ দালাল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপহার

শ্রী..র

করকমলে

....

....

শ্রী....................................

অপরাধ জ্ঞাপন

নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় সহজিয়ার মুদ্রাঙ্কনকালে প্রুফ দেখা ঘটিয়া উঠে নাই। সেই জন্য ইহাতে অসংখ্য নানাজাতীয় অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে। যে গুলি মারাত্মক তাহাদেরই একটি তালিকা দেওয়া গেল। আশা করি, যাঁহারা দয়া করিয়া বহিখানি পড়িবেন, তাঁহারা প্রথমেই অশুদ্ধিগুলি শুদ্ধ করিয়া লইয়া পাঠ করিবেন। নানাস্থানে ছেদেরও এত অশুদ্ধি আছে, যে সে সমস্ত শুদ্ধ করিতে গেলে, শুদ্ধিপত্রখানি অত্যন্ত বড় হইয়া যায়, সেইজন্য সে কার্য্যে বিরত হইয়াছি! আশা করি, পাঠকগণ সহজেই পাঠকালে সেগুলি ধরিয়া লইতে পারিবেন।

এই অশুদ্ধির আধিক্যের জন্য করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আশা আছে যে, ইহাতে যদি কিছু ক্ষীর থাকে তাহাই দয়ালু হংস-স্বভাব পাঠকবর্গ গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকারকে আপ্যায়িত করিবেন। ইতি

গ্রন্থকারস্য।

উৎসর্গ

ওঁ সহজায় স্বাহা।

দেবতা যদি ব্যগ্রহস্তে ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে এই জগতে তাঁহার পূজা প্রাপ্তি ঘটিত কিনা সন্দেহ। মানুষ জানে, যে, সে যাহা দেবতাকে দিবে তাহার সমস্তই ফিরিয়া পাইবে, উপরন্তু কিছু উপরি লাভও হইতে পারে; তাই দেবপূজায় উপচারের এত আড়ম্বর। কিন্তু হে আমার সহজিয়া, তুমি ত' দেবতা নও—তবু তোমার নামেই এই তোমারই কথা উৎসর্গ করিতেছি কেন? তুমিত, কিছুই চাহ না—শুধু অগ্নির মত আপনাকে বিলাইতেই চাও। তবু কেন তোমার দিকেই এই তোমারই ভাবহবিঃ ক্ষরিত হইতে চাহিতেছে?

কেন, তাহাত জানি না বন্ধু! তবু সহজেই যখন তোমারই দিকে ইহার গতি, তখন তোমাতেই আমার এই দানের অহংকারের পরিসমাপ্তি হউক। তোমারই পূর্ণতায় ইহার সর্ব্ব অপূর্ণতার অবসান হউক। তোমারই হইয়া এই তোমার গাওয়া গান সবারই হউক—সর্ব্বাতীতেরও হউক।

৩২১৫(৬)
৩/১১০

সহজিয়া

প্রথম অধ্যায়

প্রিয়ব্রতের কথা

একথা যদি আর কেউ শোনে তাহলে হয়ত হাসবে, কিন্তু যে রাত্রে আমি লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি, সে রাত্রের ভোরের স্বপ্নটার মধ্যেও বেজেছিল একটী মাত্র গান এবং একটী মাত্র সুর। সুরটী ছিল ভৈরবী এবং গানটীও ছিল বিরহের ঃ—

বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ
নিদ নেহি বিণু সেঁইয়াঁ।

সেই উষাটী তার আলো আঁধার নিয়ে চলে গিয়েছে, সে সুর থেমে গিয়েছে কিন্তু গানটা স্মৃতিতে রয়ে গিয়েছে। সুর হারিয়ে তাল লয় সব হারিয়ে গানের কথা কটা আজ কেবলি মনের মধ্যে উঁকি মারছে। এর আগেও কতবার সে উঁকি ঝুকি মেরেছে এবং এমন বেখাপ্পা বেমানান সময়ে যে তখন ছট্‌ফট করে কাজ কর্ম্ম ফেলে ঐ গানের হারান সুরটাকে মনের স্বরলিপির মধ্যে বুকের সারেঙ্গীর তার হাতড়ে খুঁজতে বাধ্য হতে হয়েছে। আজও তাই এই এত দিন পরে ঐ গানটা মনে পড়াতে এই হতভাগা অভ্যাসহারা হাতটাকে দিয়ে এই সাদা কাগজের ওপর কালীর আঁচড় টেনে সারেঙ্গীর ওপর ছড়টানার বৃথা অনুকরণ করছি।

কিন্তু তা হবে কেন? সে ছিল জীবনের ভোরের সময়—প্রাণ ছিল, হাজারটা ঘষা মাজা তার চড়ান, ভৈরবীর কোমল সুরে বাঁধা সারেঙ্গী; তখন লাখো পাখী তাদের লাখো রকম ডাক আমায় বিনা শুদে ধার দিত, তখন আকাশ বাতাস জলস্থল ছিল আমার না চাইতে ভরিয়ে দেবার মহাজন। তখন বয়স ছিল বাইস বছর, প্রাণ ছিল গানের সুরের মত, মন ছিল গানের কথার মত, গতি ছিল গানের ছন্দের মত তালে বাঁধা। তখন খেয়ালে বেতালায় পা পড়লেও শেষে গিয়ে সমে ঠিক মিলত, কথা হারিয়ে গেলেও ভাব কাটত না, আর সুর? সেতো প্রাণের সঙ্গে একই হয়ে গিয়েছিল, বেসুরো হব কি করে? শুনিছি লোকে বলে সন্ন্যাসী হয় সংসারে দুঃখ পেলে, কিন্তু সুখের লোটা ছাপিয়ে উঠলে কি কেউ বেরিয়ে পড়ে? আমি কিন্তু ঠিক সেই কারণেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার এই জীবন কথা যদি কেউ শোনে তাহলে দুঃখই কেবল উদাসী করে না, সুখের ভাণ্ডেও মানুষকে প্রবাসী করে, আপনাকে ভুলিয়ে সংসার ভুলিয়ে সব গুলিয়ে দিয়ে ছুটিয়ে 'গৃহছাড়া পথিক' করে দেয়। ভগবান বুদ্ধদেব সংসার দুঃখময় জ্ঞান করে 'ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত-নিবৃত্তির' পথ আবিষ্কার করতে সোনার সংসারকে চোখের জলে ভাসিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তারপর কত গুণী, কত জ্ঞানী, কত কুমারিল, শঙ্কর, রামানুজ কত কবীর, নানক, চৈতন্য সেই পথের পথিক হয়েছেন। কিন্তু সবাই সংসারকে একরকম গাল দিতে দিতেই বেরিয়েছেন। কেউ কি সুখের ঠেলায় বেরিয়েছিলেন। তাঁরা সংসারের দুঃখটাকে বড় করে দেখে বেরিয়েছিলেন—যেন সংসারের দুঃখটাই একমাত্র সত্য আর সুখটাই মিথ্যা মায়া, মায়ার প্রলোভন এবং আরো কত কি!

কিন্তু এমন কি কারো হয়েছিল যে সুখই কারো সইল না—দুঃখের টানে দুঃখের বাঁশি শুনে দুঃখকে পাবার জন্য কেউ কি বেরিয়েছিলেন? অবশ্য যাঁদের কথা বল্লাম তাঁরা একেবারে মানুষাকারে দেবতা। তাঁরা সংসারের মঙ্গলের জন্যই বেরিয়েছিলেন। তাঁদের পায়ে কোটী কোটী প্রণাম। কিন্তু তাঁরা যে প্রেমে সংসার থেকে বেরিয়েছিলেন সেই প্রেম কেবল সংসারের দুঃখটাকে দেখেছিল এবং সে প্রেম স্বয়ং সকল রকম দুঃখকে বরণ করে সংসার হতে দুঃখকে তাড়াবার ব্যবস্থাই করেছিল। ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই হয়েছিল তাঁদের পরম পুরুষার্থ। কিন্তু তাঁরা, 'দুঃখটাকেই চাই, এমন কি দুঃখানুভবই পরম পুরুষার্থ' কারণ "দুঃখে যেমন আত্মাকে জাগায়, আত্মার সচেতনত্ব প্রমাণ করে এমন আর কিছুতেই নয়," এই রকম একটা তর্ক করে কি কেউ বেরিয়েছিলেন? আমার ত মনে হয় এ বিষয়ে আমিই একমেবাদ্বিতীয়ং। যদিও প্রভু যিশু এক জায়গায় বলেছেন, "যারা কাঁদে তারা ধন্য, কারণ তারা সান্ত্বনা পাবে।" তবু তাঁর কথার মধ্যে ঐ ভবিষ্যতের সান্ত্বনাটীকেই বড় করে দেখার আভাস রয়েছে। তিনিও দুঃখকে বরণ করেছিলেন, কিন্তু দুঃখের মধ্যে আনন্দকে, সুখকে দেখে নয়—দুঃখ হতে অপরকে ত্রাণ করিবার জন্যে। 'চোখের জলের বাঁধন' ছিঁড়ে দিয়ে সংসারময় সুখের হাসির মুক্তিকেই এনে দেবার জন্যই তাঁদের যত সাধন-ভজন, সম যম দম নিয়ম!

দুঃখ কিন্তু তাঁদের আকর্ষণ করেনি, বিকর্ষণ করেছিল, ঠেলে বার করে দিয়েছিল। কিন্তু আমায় সে বার করেছিল টেনে, কারণ আমাকে সত্যি সত্যিই 'সুখে থাকতে ভূতে কিলিয়েছিল'।

সুখই আমার সয়নি। আমি দেখেছিলাম মানুষ যতই নাকি সুরে কাঁদুক না কেন সে সুখেই আছে, দারিদ্র্য, অশান্তি, রোগ, ভোগ সমস্তেরই মধ্যে মানুষ সুখেই আছে। দুঃখটাও তার সুখেরই নামান্তর, কারণ সে যদি সত্যি সত্যি দুঃখেই থাকত তাহলে সে এতদিন মরে ভূত হয়ে যেত। দুঃখ তাকে জাগিয়ে রেখেছে, তাকে ঘুমুতে দেয় নি,—ক্ষিধের দুঃখের জন্য সে অন্ন সংস্থানে ব্যস্ত, শীতোষ্ণতার দুঃখের জন্য সে বস্ত্র বয়নে গৃহনির্ম্মাণে ব্যস্ত, মনের দুঃখের জন্য সে শিল্পকলার সৃষ্টি করিতে ব্যস্ত, আর একলা থাকার ভয়ের জন্য সে সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম্ম, নীতি এই রকম কত কি না সৃষ্টি করেছে। সবই ত তার দুঃখের দায়ে, অথচ সে বরাবর বলছে দুঃখকে চায় না। কিন্তু দুঃখকে না চাইলে সে এত সব সুখ পেত কোথা হতে? সুখকে চায় বলে সে দুঃখকে চায় অথচ বলে সে দুঃখ চায় না সুখকে চায়। আমার কিন্তু চিরদিনই মনে হয় যে সে প্রাণে প্রাণে দুঃখকেই চায়—দুঃখকে না চাওয়ার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড চাওয়া চুপ করে লুকিয়ে বসে আছে। সে যেন গোপন ঈঙ্গিতে প্রাণকে বলছে, 'চাও, চাও, সুখকেই চাও সুখের দিকেই ধাও,' তারপর প্রাণ যখন দুঃখকে ছেড়ে সুখের দিকে ছুটছে, তখন তার চিরন্তন সাথী দুঃখটী খুব একচোট হেসে নিচ্চে। কারণ দুঃখের বেদনাই হচ্চে চৈতন্যের দরজার একমাত্র দ্বারী—সেই একমাত্র সোনার কাঠী যাতে ঘুমন্ত রাজ-কুমারী আত্মাকে জাগিয়ে তোলে।

যাই হোক, ছোট বেলা হতে কতকটা এই রকমের ভাব আমার মধ্যে জেগেছিল। জেনেই হোক আর না জেনেই হোক আমার মনের মধ্যে এই দুঃখের বিরহই জেগেছিল—এই যে

গোপনচারী দুঃখ যে মানুষকে ঠেলছে অথচ নিজে ধরা দিচ্চে না তারই বিরহ জেগেছিল। তাই সুখে স্বাস্থ্যে স্নেহে প্রেমে ভরা সংসারের মধ্যে থেকেও আমার কাণে কেবলি বাজত—

'বায়ু বহে পূরবৈঁয়া, নিদ নাহি বিন্নুসেঁইঞা।'

কিন্তু সেই চিরন্তন সখা? কে আমার এত কাছে থেকে এত রকমে দর্শনে, স্পর্শনে, চিন্তায়, ভাবে আমার কাণের গোড়ায় বাঁশী বাজাচ্ছে? কে সে!—সে যে কে তা কিছুই ধরা গেলনা যে! ধরা বুঝি যায় না—কারণ সেই ধরে রাখে বলেই বোধহয় তাকে ধরা যায় না। সেই প্রবৃত্তি দেয় বলেই বোধহয় তার দিকে মানুষের প্রবৃত্তি নেই। সে যে না চাওয়ার ধন, সে যে দুঃখ।

যাক্—যাক্—না ধরা যাক, চিরদিন সে অধরাই থাক! আমি চিরদিন তার মধ্যে মুক্ত হয়েই বিচরণ করি, ধরে ফেল্লে যে আমার চলার, আমার থাকারই শেষ হয়ে যাবে! না গো না—সে দুর্ঘটনা যেন কোনোদিন না ঘটে। ওগো আমার সেঁইঞা—ওগো আমার না পাবার ধন ওগো আমার চিরন্তন বিরহমূর্ত্তি ওগো আমার চিরদুঃখ, তোমায় আমি না চাওয়া দিয়ে বরণ করলাম তোমায় পাওয়া দিয়ে আমার ভাণ্ডার ভরে নিলাম।

আজও তাই লিখতে বসে সেই বহুদিনের পুরাতন গানটি মনে পড়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গেই মনে হচ্চে বায়ু চিরদিন পূর-বৈঁয়াই থাকুক—আর আমার ঘুম না আসুক কারণ সেইঞা যে এত কাছে থেকেও এতদূরে! আমি ঘুমাতে চাই না—

তার বুকে আছি এজ্ঞানটা এলেই সে সুখে এলিয়ে পড়ব। না, আমি সুখের মধ্যে আপনাকে হারাতে চাইনা—আমি জেগে আছি, তারজন্যে তাকে পাবারজন্যে তারই বিরহের মধ্যে জেগে আছি এইটেই সত্য হয়ে থেকে যাক।

"রোয়ে পিয়ারী শ্যাম করি কোর,—
'হাহা কাঁহা গয়ি প্রাণসখা মোর'।"

এমন একটা ভাবের ঘোরেই বোধ হয় আমায় বেরুতে হয়েছে। নইলে কেন বেরুলাম? আমার কি না আছে? কি না ছিল? অমন স্নেহময়ী মা বোন, অমন ভরাভাণ্ডারের স্বচ্ছলতা, অমন সুস্থ সবল দেহ মনের সুখ, অমন ভালবাসায় আদরে ঘেরা সংসার—সবই ত' ছিল, সবই হয়ত এখনো আছে—আমার জন্যেই কোল পেতে আছে, তবু আমি বৈরাগী কেন? তবু কেন একটা ভোরের আলো আঁধারের ভৈরবীসুরে আমায় গৃহছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া, সৃষ্টিছাড়া করে সবহারাণর পথে দাঁড় করিয়ে দিলে? সেই প্রভাতের ভৈরবীসুর আমার ভৈরবের ভিক্ষার ঝুলি বইবার জন্য চিরদিনের জন্য আহ্বান করলে কেন? এত লোক থাকতে সংসারে আমার মত একটা সামান্যলোককেই বা গৃহহারা করবার তার কি দরকার পড়ে গিয়েছিল?

আজ আবার তাই নূতনকরে সব হারাবার পথে দাঁড়িয়ে সেই অনেকদিনের পুরাণো গানটা মনে পড়ছে। কিন্তু সুরটা যেন কিছুতেই মনে আনতে পারছিনে। কেবল সুরে সুরে সেই কণ্ঠটাই মনে করতে চেষ্টা করছি কেন আমি বেরিয়েছিলাম, কে আমায় টেনে বার করেছে?

২

এতদিন এই খাতাখানা বৃথাই বয়ে মরেছি! কোথাকার যতরাজ্যের গান কুড়িয়ে আর পরের কথা কুড়িয়ে পুঁজি করে আসছি। কিন্তু হঠাৎ আজ মনে হল দূর ছাই পরের কথাই কুড়িয়ে মরলাম আজ আবার নূতন করে সব ছেড়ে যাবার দিনে এতে আমার এতদিনকার অন্তরের ঝুলিটা ঝেড়ে রেখে দিয়ে যাই। তাই যে দুদিন এখানে আছি আর দোঁহা কুড়ানো নয়, গান কুড়ানো নয়, কথা কুড়ানো নয়, শুধু আপনাকে এই খাতাটার বাকী পাতা গুলোর মধ্যে ধরাদেবার চেষ্টায় সারাদিন খাটব। রুটী পাকান নয়, চিমটে ঝন্ ঝন্ করে সারাপথ ভিক্ষে করে বেড়ান নয়, বিবেকচূড়ামণির শ্লোক ব্যাখ্যা নয়, শুধু আপনাকে নিয়ে নাড়া চাড়া, আপনার কাছে আপনার ধরা দেওয়া। তারপর সব ছেড়েদিয়ে এখানাকেও চিরদিনের মত যার জন্য লেখা তার কাছে ফেলে দিয়ে একবার ডুব মারব।

কিন্তু আমিত রাজপুত্র নই, মন্ত্রীরপুত্র নই, সওদাগরের পুত্র নই, কোটালের পুত্রও নই তবু সাতরাজার ধন মাণিক খুঁজতে বেরিয়েছি। এ মাণিক আমায় পেতেই হবে। অন্নে আমার মনের ক্ষিদে কিছুতে মিটবেনা। যদি মিটত তাহলে স্নেহময় সংসারের একমাত্র ধন হয়ে আমি চির অপ্রাপ্য সাতরাজার ধন মাণিকের জন্য বৃথা বেরুতাম না। যেদিন আমার চারিদিকে সংসার তার স্নেহের জাল ভাল করে জড়াচ্ছিল, যেদিন বিধবা মার বিরস মুখে স্বর্গের হাসি ফুটে উঠেছিল, যেদিন বন্ধুবান্ধব-

গণের আনন্দ কলরবে আমার বাড়ীটা মুখরিত হয়েছিল, যখন আমাদের গ্রামের বাবুদের বাড়ীতেও পাঁচটা পাশ করা সুন্দর সচ্চরিত্র জামাই পাওয়া যাচ্ছে বলে সাতদিন হতে নহবত বসিয়ে তাঁদের আনন্দ সারাগ্রামে ছড়াচ্ছিলেন, যখন আমাদের গ্রামের দীন দরিদ্র ইতর ভদ্র সবাই যাত্রা গান থিয়েটার এবং চোব্য চোষ্য লেহ্য পেয় সব রকম আনন্দ উপভোগ করে আমায় আশীর্ব্বাদ করছিল, ঠিক সেই সময়, সেই গায়েহলুদের রাত্রে আমার কাণে শানায়ের শব্দে কেবলি ঐ গানটাই বেজেছিল কেন? কে জানে কেন?

কিন্তু আমার এত সুখ সৈল না যে, তাই ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। পথ তখন জন শূন্য—তখন সবেমাত্র ঊষার আলো দেখা দিচ্ছিল—জমিদার বাবুদের বাড়ীতে আমারই জন্য তখন সবেমাত্র শানায়ের ভোরের তান ছেড়েছে। তখনও কোকিল ডাকেনি, ফিঙে জাগেনি, গাছের নূতন পাতাও বুঝি নড়ে নি। শুধু জেগেছিল আমার উদাসী প্রাণ। অনির্দ্দেশ যাত্রার জন্য যে প্রাণটা বৎসরাবধি ছট্ ফট্ করছিল, সেই প্রাণই ঐ রাত্রের সমস্ত চাঞ্চল্যকে ছাড়াকাপড়ের মত আমার শয়ন ঘরে ফেলে-দিয়ে ফাগুনের মিলনের ঊষার বিরহে গেরুয়া পরে বেরিয়ে পড়ল। পূর্ব্বাকাশে যে রঙটা ফুটেছিল তাতেও যেন গেরুয়ারই রঙ্ দেখতে পেয়েছিলাম, আমের মুকুলে আর কিশলয়েও যে সেই বৈরাগ্যের রঙ লেগেছিল আর পলাশগাছ ত একেবারে লালী হলুদে কাপড় পরে বৈরাগী সেজে আমার জন্যেই পথের ধারে ধারে বাঁকে বাঁকে দাঁড়িয়েছিল। আমি কিন্তু ছুটছিলাম,—কোনদিকে না চেয়েই ছুটছিলাম, তবু কি জানি

কোন ফাঁক দিয়ে সেই ভোরের সমস্ত রূপ রস গন্ধ শব্দ আমার মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে এমনি ছাপ দিয়েছিল যে আজও আমি তা ভুলতে পারিনি। আজও মনে পড়ছে, সেই বাঁশীর সুরটী, সেই ভোরের আলোটুকু, সেই পলাশ শিমুলের লালে লাল হয়ে যাওয়া।

তারপর হিমালয় হ'তে মকরালয়, কেদারনাথ হ'তে রঙ্গনাথ, আদিনাথ হ'তে সোমনাথ, কামাখ্যা হ'তে হিঙ্গুলা, সারা ভারতবর্ষের সমস্ত দুর্গম সুগম স্থান সমস্তইত' এই কবছর ঘুরে মরলাম, কত দেখলাম, কত শুনলাম, কত বুঝলাম, কত ভুললাম, তবু সেই প্রথম প্রব্রজ্যার প্রথম ঊষার ছাপটুকুত' কিছুতেই ভোলা গেল না। ভোলা বুঝি যায় না—তাই কি ? হবে।

কিন্তু ভুলতে ত' হবে ; এই সব-ভোলার পথে বেরিয়ে, ভুলব ভুলব করে দিন কাটালে ত চলবে না ? সেই সেদিনকার সুখ, সেই প্রচণ্ড দুঃখ ভরা আনন্দটাকে ত' ভুলতে হবেই ? এই দুঃখের পথে বিরহের পথে বেরিয়ে হারাণ সুখটুকুর জন্য কেঁদে মরলে চলবে কেন ? যে দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখী করবার জন্য বেরিয়েছে তাকে দুঃখকেই সুখ বলে অনুভব করতে হবে। নইলে কেন বেরিয়েছি ? কেন এই অকারণ দুঃখের বোঝা, আপন ভাবনার বোঝা বয়ে বেড়ান ? আপনাকে সেই পুরাতন সংসারের ক্ষুদ্র সুখের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেই ত' হত।

কিন্তু সেই মৃদু সুখে আমার ক্ষুধা ত' মেটেনি। প্রাণ চেয়েছিল এমন একটা ভয়ঙ্কর সুখ, যার আগুণের মত জ্বালা, মদিরার মত

উন্মাদনা, মৃত্যুর মত ধ্রুবত্ব। কিন্তু কোথায় সেই প্রচণ্ড দুঃখের উন্মত্ত সুখ? কোথায় গো কোথায়? এইত' সারা সংসার ঘুরে বেড়ালাম, কত অনাহার অনিদ্রাতে শ্রান্তি ক্লেশের মধ্যে অশ্রান্তভাবে ছুটে বেড়ালাম, কিন্তু কোথায় সে? সেই ত' যেখানে গিয়েছি সেইখানেই সংসার আমার জন্য দুহাত বাড়িয়ে আছে এবং যা যখন তার হাতের গোড়ায় ছিল তাই দিয়ে আমায় সুখী করবার চেষ্টা করেছে। কৈ কোথাও ত' দুঃখ-ভৈরবকে খুঁজে পেলাম না? কোথায় প্রভু, কোথায় তুমি শ্মশানালয়বাসী মরণতাণ্ডব-মগ্ন মহানন্দময় দুঃখ-ভৈরব? এত ক্লেশ, এত ক্লান্তি এত ভয়ের মধ্যেও ত' তোমায় পেলাম না। পেলাম কেবল সেই চিরন্তনী অন্নপূর্ণা সদাপূর্ণা, চিরসুখময়ী জননীকে। তোমায় ত' পেলাম না প্রভু! তুমি মায়ের কোলে সংসারকে ছেড়ে দিয়ে কোথায় লুকিয়ে রইলে? হে দেশকালাতীত, হে চির অপ্রাপ্য, তোমায় কি পাবনা? না পাই, তবু খুঁজতেও ত' ছাড়ব না—না খুঁজে যে উপায় নেই। তোমার শিঙ্গা যখন একবার কাণের কাছে বেজেছে তখন কি করে আর চুপ করে থাকা যাবে? হে পথ-স্বরূপ, হে গতি-স্বরূপ, তোমার চিরস্থিত পথে চিরচঞ্চল গতিকেই অবলম্বন করলাম।

তোমার পথে বেরিয়েছি বটে কিন্তু এ পথের পথিক কৈ? পথপ্রদর্শক কৈ? কে আমায় পথ বলে দেবে, সাহস দেবে, শক্তি দেবে? তা যে খুঁজে পেলাম না। সবাই বলে "আমার পথে চল, অন্য পথ নেই। তোমার পথ পথ নয়, আমার পথই পথ।" আমার পথটা আমি দেখছি, কিন্তু সে বলছে "ভুল দেখছ। যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে ভুল দেখছি—তার পথই পথ, "নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" কিন্তু আমি যে দেখছি আমার

পথ ঐযে সামনে সোজা পড়ে রয়েছে, এবং সবাই তাতেই চলছে। কিন্তু বলবার সময় বলছে যে এ পথ তারই আর কারো নয়। আমার পথেই সবাই চলছে, তবু বলছে "এ পথ তোমার নয়, আমার।" একি রকম উল্টোপাল্টা!

আমি গুরু খুঁজে মরছি, কিন্তু এতদিন চললাম কি করে তাত' ভেবে দেখিনি? তাই আজ হঠাৎ মনে হচ্চে, আমার পথ আমারই, আমার গুরু আমিই আর কেউ পথ বলে দেবার নেই। তাই কি?—

কিন্তু এই আমার নিরুদ্দেশ যাত্রার অগ্রগামী যাত্রীকে খুজে বেড়াতে বেড়াতে যাদের যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে তাদের সবারই কথা কি লিখতে হবে নাকি? না না সে যে বেজায় বড় ব্যাপার হয়ে উঠবে, তার সময় কৈ? কিন্তু দু' একজনের কথা যে না লিখলেই নয়। তাদের কথা না লিখলে যে আমার চলছে না। কেন? তা বলতে পারিনে, কিন্তু তাদের কথা লিখতেই হবে। তারা যে আমার অস্তিত্বের সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে।

৩

সত্যকে খুঁজতে বেরিয়ে প্রথমেই মিথ্যাকে আশ্রয় করতে হয়েছিল, নাম ভাঁড়াতে হয়েছিল। এমন কি চেহারাটা পর্য্যন্ত বদলাতে হয়েছিল। সেই এক অদ্ভুৎ ব্যাপার—নিজ হাতে চুল-ছেঁটে, গোঁফ কামিয়ে গেরুয়া পরে শুধুপায়ে প্রথম দিন চৌদ্দ পনর ক্রোশ পথ অতিক্রম করে সন্ধ্যায় একটা গ্রামের বাইরে গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। কিন্তু কে জানত যে এই

অনন্তগতির পথে সেই প্রথম মুহুর্ত্তে আমার প্রথম আঘাত পেতে হবে।

সূর্য্য তখন মাঠের পারে সবে মাত্র অস্ত গিয়েছেন। সুমুখেই একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে। রাখাল বালকেরা গরু নিয়ে গ্রামে ফিরছে। শ্রান্ত ক্ষুধার্ত্ত আমি আমার কম্বলখানা একটা অশ্বথ-গাছের তলায় বিছিয়ে সবে মাত্র বসেছি। এমন সময় কোথা হতে এক বাবাজী এসে উপস্থিত হলেন—সঙ্গে একটী অল্পবয়সী গেরুয়াপরা স্ত্রীলোক! বাবাজীর বয়স যে কত হবে বলতে পারিনে, কিন্তু দেখে ত' চল্লিশ পঁয়তাল্লিশের বেশী বোধ হল না। ঘাড়ে একটা প্রকাণ্ড ঝোলা, মস্ত একটা লাঠী আর হাতে একটা করঙ্গ। মেয়েটীর ঘাড়ে কোনো বোঝা নেই কেবল হাতে একটা একতারা,—যেন সমস্ত বোঝা নিজের স্কন্ধে নিয়ে বাবাজী কেবল আনন্দের বোঝাটুকু মেয়েটীর হাতে দিয়েছেন, এমন কি ছাতা ছুটোও নিজের পুঁটলীর সঙ্গে বেঁধে নিয়ে মেয়েটীকে সম্পূর্ণ মুক্ত রেখে দিয়েছেন।

আমি কিন্তু তাঁদের অবস্থা দেখে প্রথমটা হেসেই উঠেছিলাম। বাবাজী আমার দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁকে দাঁড়াতে দেখে মেয়েটীও দাঁড়ালেন। বাবাজী চেয়ে চেয়ে বল্লেন, "ছিঃ বাবা ঘরে ফিরে যাও, এ পথত' তোমার নয়।" আমি চমকে উঠে বল্লাম "কেন বলুনত'?"

বাবাজী আস্তে আস্তে তল্পিতল্পা নামালেন। তারপর একখানা কম্বল বিছিয়ে মেয়েটীর দিকে চাইতেই মেয়েটী তার ওপর বসে পড়ল। বাবাজী একখানা পাখা বের করে মেয়েটীকে বাতাস করতে করতে বল্লেন, "বাবা, সংসার থেকে আজ চল্লিশ বছরের

ওপর হল বেরিয়েও এই দেখ আমার দশা, আজ বুড়ো বয়সেও আবার সেই সংসারই এসে আমার ঘাড়ে চেপেছে। তুমি নতুন বেরিয়েছ গ্রামের মধ্যে পর্য্যন্ত যাবে না এমনি তোমার নবীন বৈরাগ্যের অনুরাগ; কিন্তু যখন আমার মতন হবে তখন বুঝবে যে যাকে ত্যাগ করে পালাচ্ছ সে তোমার সঙ্গে সঙ্গেই যাচ্ছে। যে দিন সময় পাবে সেই দিনই সে ঘাড় মটকে ধরবে। তাই সাবধান করে দিচ্ছি ভুক্তভোগীর কথা শোনো, ফেরো।"

বাবাজীর অসাধারণ সূক্ষ্মদৃষ্টি দেখে আমার খুব কৌতূহল জেগে উঠল, একনিমেষেই আমার সবটুকুই যেন তাঁর চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল। তবু তখন নতুন অনুরাগ বলে তর্ক করবার প্রবৃত্তি আর শক্তিটাও যথেষ্ট প্রবল। আমি বল্লাম, "আমি নতুন বেরিয়েছি বটে, কিন্তু আপনার পক্ষে যে সংসার ত্যাগ করা অসম্ভব হয়েছে, আমার পক্ষে তা খুব কষ্টসাধ্য হয়নি। আমি দুঃখে সংসার ছাড়িনি, সুখে ছেড়েছি—সহজেই ছেড়েছি। আপনি যে নারীকে এই শেষ বয়সেও ছাড়তে পারেননি, সেই নারীকেই, আমি বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রেই পায়ে ঠেলে চলে এসেছি। আমার পক্ষে বৈরাগ্য সহজেই হয়েছে।"

বাবাজী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন "যাকে পায়ে ঠেলে এসেছ, তাকে শেষে হয়ত মাথায় করতে হবে। যাক বাবা আগে থাকতে সাবধান করে দিলাম এইমাত্র, এখন গোবিন্দের ইচ্ছাই সফল হোক।"

আমি সন্ন্যাস নিতে বেরিয়েছি, কিন্তু নবীন অনুরাগের প্রচণ্ড অহঙ্কার যাবে কোথায়? সেটা বেরিয়ে পড়ল,—আমি হেসে বল্লাম "আপনি কি গোবিন্দের ইচ্ছাতেই এই বৈষ্ণবীটী জোগাড়

করেছেন।" বাবাজী ছল ছল নেত্রে আমার দিকে চেয়ে হঠাৎ সেই মেয়েটীর পায়ে প্রণাম করে বল্লেন, "হ্যাঁ বাবা, এটী আমার গোবিন্দের মূর্ত্তিমতী ইচ্ছা।"

আমি ত অবাক! মেয়েটী চুপ করে বসে রৈল, নড়লেও না চড়লেও না। বাবাজী তাকে বাতাস করতে করতে বল্লেন, "তাহলে, এমন সাধুসঙ্গ পাওয়া গেছে, আজ এইখানেই আস্তানা হোক।" মেয়েটী মাথানেড়ে সম্মতি দিলেন। বাবাজী অমনি উঠে, তাঁর তল্পি হতে কত কী বার করে ফেল্লেন। কাঠ জোগাড় হল, ধুনি জ্বালা হল, এমন কি রান্নাও চড়ান হয়ে গেল। আমি অবাক হয়ে গোবিন্দের ইচ্ছা দেখতে লাগলাম। বাবাজী হঠাৎ বলে উঠলেন, "সাধু মহারাজ, আপনি ত নিজের জন্যে কিছু করবেন না, আমার জন্যে একটু চেষ্টা করে যা হয় চড়িয়ে দেন না—আমায় এমন প্রবল বৈরাগী সাধুর সেবা করবার অবসর দেন না?"

বাবাজী এতক্ষণ আমায় "তুমি তুমিই" করছিলেন হঠাৎ আপনি বলে কেন সম্বোধন করলেন বুঝতে পারলাম না। যাই হোক আমিও নিজের জন্য কিছু জোগাড় করে নিলাম। আমার নিজের কাছে কিছুই ছিল না, সবই বাবাজীর ঝোলা হতেই পেলাম। আমরা দুজনে আহার্য্যের জোগাড়ে ব্যস্ত, এমন সময় মধুর বামাকণ্ঠে এমন স্বর লহরী সেই নির্জ্জন স্থানের আকাশ বাতাসকে ভরে ফেল্লে যে আমার প্রবল বৈরাগ্যপূর্ণ হৃদয়ও অনিচ্ছায় অজ্ঞাতে বল্লে,

যদেহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন কুত্রাবিৎ।

মেয়েটী যে কি গান গেয়েছিলেন তা মনে নেই, কেবল মনে আছে একটা আনন্দ, একটা মধুর অশান্তি, একটা অপরূপ সৌন্দর্য্যে

ও রসে আমার সমস্ত অস্তিত্বটা ভরে উঠেছিল। আমি রাঁধতে বসেছিলাম কিন্তু এমনি একটা অযাচিত মধুরসে আমার প্রাণ ভরে উঠেছিল, যে, আমি তন্ময় হয়ে ধুনির সম্মুখে চুপ করে বসেছিলাম। হঠাৎ গান থামলে বাবাজীর দিকে চেয়ে দেখি তিনি জোড়-করে না জানি কাকে প্রণাম করছেন, ধুনির আলোতে তাঁর মুখখানি রাঙ্গা হয়ে উঠেছে আর বোধহল যেন তাঁর সেই রাঙ্গা মুখখানা অশ্রুতে ভিজে ডব ডব করছে।

আহার করতে বসে যা দেখলাম তা আবার আরও আশ্চর্য্য মেয়েটী বসে আছেন আর বাবাজী তাঁকে খাইয়ে দিচ্ছেন। তারপর তাঁর আহার শেষ হলে তাঁর মুখ ধুইয়ে দিয়ে নিজে সেই এঁটোপাতে বসে গেলেন; এবং আহারাদি শেষ করে, ঝুলি হতে পানের একটা ছোট বাটা বার করে ধুনির আলোতে পান সাজলেন, মেয়েটীকে খাইয়ে নিজেও একটা খেলেন।

আমার চোখে এটা এমনি আশ্চর্য্য, এমনি বিশ্রী ঠেকছিল যে আমি আর থাকতে পারলাম না, গম্ভীর মুখে বল্লাম "বাবাজী, একটা ঘর বাঁধুন গে, এমনি করে কি সংসার করা হয়?" বাবাজী হেসে বল্লেন, "বাবা আমি জগৎ-মঠের লোক, এতবড় বাঁধা ঘর আমার রয়েছে, আমার কি এক কোণে বসে থাকলে চলে? সারা ঘরটাত' বেড়িয়ে দেখতে হবে? তাই সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছি। ঘরের গিন্নী সঙ্গেই আছেন, বসতে দেবেন কেন?"

আমি তর্ক করতে লাগলাম, কিন্তু বাবাজীর দেখলাম অতাত শরীর, বিদ্রুপেও তাতে না, গালি গালাজেও তাতেনা, তর্কেও না—কেবল হেসে হেসে আমায় হাসিয়ে দেন। আমি মাঝে মাঝে

ধুনিটায় খড়কুটো দিয়ে আলোটাকে বাড়িয়ে তুলি, আর ঐ অদ্ভুৎ মানুষ দুটীর মুখের ভাব দেখবার চেষ্টা করি। মেয়েটী উদাসভাবে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বসে আছে, বাবাজী তাকে বাতাস করে মশা তাড়াচ্ছেন, আর আমার সঙ্গে কথা বলছেন। মেয়েটীর মনের অবস্থা জানবার জন্য আমার মাঝে মাঝে কৌতূহল হচ্ছে— কিন্তু ব্রত ভঙ্গের ভয়ে তাকে কোনো কথা বলা হচ্ছে না। সেও এমনি একটা ভাব করে বসে ছিল যেন আমরা কেউ সেখানে নেই, যেন আমরা দুজন দুটী অশরীরী শব্দমাত্র। যেমন গাছের মধ্যে নিশাচর পাখারা শব্দ কচ্চে, মাঠে ঝি ঝিঁ পোকা ডাকছে, শেয়াল ডাকছে, মাঝে মাঝে দূর হতে মানুষেরও আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে আমাদের কথাবার্ত্তার আওয়াজও যেন তাঁর কাছে সেই রকম আওয়াজ মাত্র। সে আওয়াজে যোগ দেবারও দরকার নেই।

আমি অনেকক্ষণ তর্ক করে শেষে শুয়ে পড়তে বাবাজীই বল্লেন, "আহা শোন, শোন—বাতাস করব? মশা লাগছে?"

আমি বল্লাম, "না—না সেকি কথা? আপনি যা করছেন তাই করুন।"

আমি চুপ করতেই সব চুপ হয়ে গেল। সেই নির্জ্জন স্থানের গাঢ় নিস্তব্ধতা আমার ওপর চেপে বসল। আমি সেই একাকীত্বের মধ্যে ঐ দুইটী সঙ্গীর সান্নিধ্যকে যেন ভগবানের দান বলে গ্রহণ করে নিদ্রাকে আশ্রয় করবার চেষ্টা করলাম। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়লাম, মনে নাই কিন্তু হঠাৎ এক সময় জেগে দেখি পূর্ব্বদিকে চাঁদ উঠে গাছের তলাটা আলোয় ভরে ফেলেছে বাবাজী গুণ গুণ করে গান করছেন এবং মেয়েটী আমার কম্বলের কাছে

বসে আমায় বাতাস করছেন। আমিত' ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বল্লাম, "একি ? এ ভারি অন্যায় ! আমার ব্রতভঙ্গ করবার তোমরা কে ?"

মেয়েটী সরে গেলেন। বাবাজী হেসে বল্লেন, "গোবিন্দের ইচ্ছা মহারাজজী, রাগ করছেন কেন ? আপনি মশার কামড়ে ছট্‌ফট্‌ করছিলেন রাধাণীর ইচ্ছা হল আপনার সেবা করতে, আপনি সে ইচ্ছায় বাধা দিচ্ছেন কেন ?" আমি রেগে বল্লাম "আপনার গোবিন্দের ইচ্ছা আপনারি থাক, আমার ঘাড়ে চাপাবেন না। আমার গোবিন্দের ইচ্ছা এ সব ত্যাগ করা। আপনি সে ইচ্ছায় বাধা দিচ্ছেন কেন ?" বাবাজী বল্লেন, "বাবা আমি গোবিন্দের ইচ্ছায় ত' বাধা দিইনি, আপনার মধ্যে গোবিন্দজী মশার কামড়ে ছট্‌ফট্‌ করে রাধারাণীর সেবা চাচ্ছিলেন, তাই রাধারাণী সেবা করেছেন। ভয় কি আপনার আসনত' রাধারাণী স্পর্শ করেন নি। আপনার ব্রতভঙ্গ কি রাধারাণী করতে পারেন ? কিন্তু বাবা গোবিন্দের যেদিন ইচ্ছা হবে, সেদিন তোমার এই ভয়ের এই মিথ্যে সংস্কারের মায়াজাল এক নিমেষে ছিঁড়েখুঁড়ে দিয়ে তোমার অন্তরের বাগানে রাধারাণীর কুঞ্জ স্থাপনা করে দেবেন। এ তোমায় বলে রাখলাম।"

আমার রাগ ক্রমশঃ পড়ে এল, কারণ এমন স্তব্ধরাত্রে এমন চাঁদের আলোক, অমন বিস্তৃত একান্তের মধ্যে রাগ করে থাকা অসম্ভব, আমি পাশ ফিরে শুয়ে বল্লাম "দোহাই বাবাজী আপনার গোবিন্দের ইচ্ছা এই নতুন পথিকটীর উপর হতে সম্বরণ করুন, নইলে এখনি আমায় এস্থান ত্যাগ করতে হবে।"

বাবাজী কোনো উত্তর দিলেন না, আপন মনে গান গাইতে লাগলেন। তাঁর একতারাটা যেন একটীমাত্র সুর তুলছিল

"আনন্দম্‌, আনন্দম্‌," আর তিনি সেই একটী মাত্র সুরকে বহুরূপে বহুতরঙ্গে ফুটিয়ে তুলে গাইছিলেন--

"কি খেলা খেলছ ওগো সুখের মাঝে দুখের মাঝে?
কি যে জাল বুন্‌ছ তুমি আমার মাঝে তোমার মাঝে?"

গান শুনতে শুনতে আমার ঘুমিয়ে পড়া অসম্ভব হয়ে উঠল। আমি উঠে বসে বল্লাম, "বাবাজী আপনি কি ঘুমুবেন না?" বাবাজী হেসে বল্লেন, "ঘুম? ঘুমুতে কি আর দেবে?" আমি অমনি তর্ক জুড়ে দিলাম। মেয়েটি অমনি গান জুড়ে দিলেন, আর তর্ক করা হলনা। চুপ করে শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে রইলাম। বাবাজীর সঙ্গে বাবাজীর বৈষ্ণবীটির গানের তান ছোড়াছুড়ি আনন্দ ছোড়াছুড়ি আরম্ভ হয়ে গেল। আর আমি সেই একান্ত স্তব্ধ সুন্দর রাত্রে একলা সেই দুইটী আনন্দের যুদ্ধ দেখ্‌তে দেখ্‌তে কেমন ধারা হয়ে গেলাম বলতে পারব না; এবং কখন যে আমার অজ্ঞাতে উষাদেবী পূর্ব্বাকাশে দেখা দিলেন জানতেই পারলাম না।

তারপর আজ কত বৎসর চলে গিয়েছে, কিন্তু জগৎ-মঠের সেই কুঞ্জধারী বৈষ্ণবটীকে আর দেখতে পাইনি;—কিন্তু ভুলতেও ত' পারিনি। কোথায় তাঁরা? কে বলে দেবে কোথায়? এই যে আজ এই কত বৎসর পরে হঠাৎ তাঁরই ভবিষ্যৎবাণী সফল করে ফেলে, আবার সেই চিরদিনকার সংস্কার বশে হাতের জিনিষ পায়ে ঠেলে পালাচ্ছি এই সময় যে তাঁকে একবার দরকার বোধ হচ্ছে। এখন কি একবার তাঁদের দেখা পাওয়া যায় না? না যাক, তবু আবার একবার দেখতে হবে, আমি চিরদিন যে পথে চলেছি, চিরদিন যে প্রবল ত্যাগকে বড় করে দেখে এসেছি, সেই

পথই পথ কিনা ? দুঃখভৈরবকে আবার খুঁজতে বেরুচ্ছি, চিরদিন তাঁকেই খুঁজে এসেছি, চিরদিন তাঁকেই খুঁজব। কোথায় তুমি ওগো কোথায়? এই যে অযাচিত ভাবে আমায় আনন্দ দিচ্ছ, এই কি তোমার স্বরূপ ? তাই যদি হয় প্রভু তবে তা কেন বুঝতে দিচ্ছনা ? তবে কেন দুঃখ মন্ত্রে দীক্ষিত করলে ? যদি আগুণের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেও তুমি শীতল জল হয়ে আমায় ঘিরে ধর, কোলে কর, তবে কেন আমায় অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করলে ? কেন, প্রভু কেন ?

৪

তার পর যাদের যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদের সবারই কথা লিখে রাখার দরকার নেই। যে সব দোঁহা যে সব গান, যে সব বচন, এই হতভাগা খাতাখানার প্রথম পাত গুলোয় ধরে রেখেছি তাতেই তাদের কথা বলা হয়েছে। এদিকটা কেবল আমার কথাতেই ভরব আর কারো নয়।

শাস্ত্র বলেছেন,—বৈরাগ্যমেবাভয়ং—আমিও সেই অভয়কে বুকে নিয়ে সারাসংসার ঘুরে বেড়ালাম এবং সেই জন্যই বোধ হয় অভয়কে আর খুঁজেই পেলাম না। কোথায় হে ভয়ানাং ভয়ং, কোথায় তুমি ভীষণং ভীষণানাং ? তোমায় যে খুঁজেই পাই না! প্রভু পুরাণে পড়েছিলাম এক দৈত্য নারায়ণকে দুঘা দেবার জন্য সারাসংসার তাঁকে তাড়া করে নিয়ে বেড়িয়েছিল। ঠাকুর কোথাও জায়গা না পেয়ে শেষে সেই দৈত্যের বুকের মধ্যেই চুপচাপ ঢুকে বসে ছিলেন। দৈত্য বেচারী সারাসংসার খুঁজে তাঁকে আর না পেয়ে শেষে যাই নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ী ফিরে গিয়ে বসেছে অমনি

তার বুক থেকে বেরিয়ে ঠাকুর সাগরতলে গিয়ে লুকুলেন। আমারও তাই হয়েছে নাকি? তাহলে ত' চুপ করে বসা হবে না, বসলেই ত' সে বুক থেকে বেরিয়ে লম্বা দেবে।

আমি এই রকম একটা তর্কই বোধ হয় অজ্ঞানে করে ফেলেছিলাম, এবং সেই সিদ্ধান্তই এখনো আমায় পেয়ে বসে রয়েছে।

যাই হোক চলন্ত মন্দিরে অচল ঠাকুরকে অজ্ঞাতে বহন করে, আমি যেবার কেদার বদরি নারায়ণের পথে চলছিলাম তারই কথা বলব। পাহাড়ের পথে চলার আনন্দে আমার ভয়ঙ্কর ঠাকুর অভয় মূর্ত্তিতে পদে পদে ধরা দিচ্ছিলেন, তবু ধরতে পারিনি। অরূপ ঠাকুর বহুরূপে আমায় দেখা দিচ্ছিলেন তবু দেখতে পাইনি। তবু বাইরের না-ধরাটাকে অন্তরের ধরা বলে ধরে নিতে, বাইরের না-দেখাটাকে অন্তরের দেখা বলে ধরে নিতে, আমার অন্তরের অন্তর এক মূহূর্ত্তও বোধ হয় ভুল করেনি। কিন্তু এমনি আমার পাগল প্রাণ, এমনি আমার বৈরাগী মন যে সব পাওয়াকে ত্যাগ করে ছুটেই চলেছিল। বন্ধুর পথে ক্লেশের পথে ভয়ের সেই পরম বন্ধুকে ক্রমাগত পেয়েও আমার মনটা যে কিছুতেই তাঁকে পাওয়া বলে স্বীকার করেনি, এখনও যে সেই চির-অপাওয়া রয়েই গিয়েছে! যাক—যাক—তাই হোক!

কিন্তু আমিও ত' ছাড়াছিনে। সাত রাজার ধন পেতেই হবে, নইলে কি মরব নাকি? কিছুতেই মরা হবে না আমি অমৃতের ছেলে যে, মরব কি করে? ও কথা যাক—

এইবার যার কথা লিখব সেই আমার সন্ন্যাস জীবন আকাশের মধ্যাহ্নসূর্য্য। কিন্তু দুদিনের জন্য সেই আলোর সাহচর্য্য পেয়ে-

BASIC TRAINING COLLEGE

6884

ছিলাম; তবু তাকে আমার সইল না। তার উজ্জ্বল আলোককে মায়ার ছায়ায় কোমল করে নিতে গিয়ে তাকে হারাতে বাধ্য হয়েছি। সে আমার জীবনের দিকচক্রবালের তলে নেমে গিয়েছে, আর কি উঠবে, আর কি দেখা হবে!

তার সঙ্গে দেখাটাও এক অদ্ভুৎ রকমে হয়েছিল। আমি তখন বদরি কেদার যাবার জন্য হিমালয়ের পাদদেশে উপস্থিত হয়েছি। বেলা তখন ঠিক দুপুর! আমার একটা বদ অভ্যাস বাল্যকাল হতেই হয়েছিল যে কাউকে না খাইয়ে আমি খেতে পারতাম না। সন্ন্যাসী হয়েও সে অভ্যাস যায়নি, তাই ভিক্ষা করে ফিরবার মুখে একটী অতিথিও জুটিয়ে এনেছিলাম—একটী দুর্ভীক্ষ পীড়িত বালক।

আমি আমার ভোজ্য প্রস্তুত করে দেবতাকে নিবেদন করিছি, বালকও ক্ষুধাতুর নয়নে সেই দিকে দৃষ্টিপাত করছে, আমি কেবল আমার শাঁখটায় একটা দীর্ঘ ফুৎকার দিয়ে নামিয়ে রেখেছি, এমন সময় পাশে চেয়ে দেখি জটাজুটসমাযুক্ত তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি,—আমার নিবেদিত আহার্য্য বস্তুর দিকে দৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছেন। আমিও উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে যাচ্ছি এমন সময় তিনি আমার ত্যক্ত আসনে উপবেশন করে ওঁ ব্রহ্মার্পনমস্তু বলে আহার করতে আরম্ভ করলেন।

ক্ষুধাতুর বালকটীর কালো মুখ আরও কালো হয়ে গেল, আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম হয়তো মধ্যাহ্ন গগনে সূর্য্যনারায়ণও থমকে দাঁড়িয়ে এই অদ্ভুৎ মানুষটীর অদ্ভুৎকার্য্য দেখছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো দিকে দৃষ্টি না করে ভোজন পাত্রটী নিঃশেষে শেষ করে আচমন করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর মৃদু হেসে

8013 6313

আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "ওঁ তৃপ্তোস্মি।" এই বলে তিনি চলে গেলেন।

তিনি ত তৃপ্ত হয়ে চলে গেলেন, কিন্তু এই দুইটী ক্ষুধাতুর প্রাণীর কি হল? কি আবার হবে? আবার আহার্য্য প্রস্তুত হল কিন্তু আমার জন্য নয়—ঐ বালকের জন্য। কি জানি কেন আমার আহারের প্রবৃত্তি একেবারে চলে গিয়েছিল। আমি কেবল ঐ তেজঃপুঞ্জ মানুষটীর কথা ভাবতে লাগলাম। কেবলি মনে হতে লাগল এ কেমন সৃষ্টিছাড়া মানুষ! চাওয়া নেই, চিন্তা নেই, অমনি এসে যা সুমুখে পেলে তাই খেয়ে চলে গেল? সভ্যতার ধার ধারে না, নিয়মের ধার ধারে না, না বলে, না কয়ে পরের জিনিষকে আপনার করে নিয়ে ব্যবহার করলে! দয়া ধর্ম্ম নেই, কোনো বন্ধন নেই অথচ এমন প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি যে হঠাৎ বারণও করা গেল না।

আমার সমস্ত রাত্রি ঘুম এলনা, ঐ অদ্ভুত মানুষটার মূর্ত্তি ক্রমাগত মনের চক্ষের সম্মুখে জেগে উঠে আমায় ব্যস্ত করে তুল্‌লে। তাই প্রভাতে উঠে তার খোঁজে বেরুলাম। কিন্তু কোথাও তাঁর দেখা পেলাম না। তখন আবার ভিক্ষা করে এনে দ্বিপ্রহরে ঠিক অমনি করে রেঁধে বেড়ে বসে রইলাম; দুবার শাঁখেও ফু দিলাম, কিন্তু কৈ সেত এল না।

তার পরদিনও তাঁর খোঁজ করলাম, কেউ তার খোঁজ দিতে পারলে না। কেউ তাকে চেনেই না। আমার কিন্তু আর দেরী করা চল্ল না, কারণ যাত্রীর দল পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। আমাকেও লোটা কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল। কিন্তু দুদিন চলতে না চলতেই আবার তার সঙ্গে অদ্ভুৎ অবস্থায় দেখা।

পাহাড়ের সংকীর্ণ আর পিছল রাস্তায় অতিকষ্টেই চলতে হচ্ছিল, পা পিছুলেই একেবারে হাজার হাত তলায় পড়ে যেতে হবে। আমি কোনো দিকে না চেয়ে চলছিলাম, এমন সময় দূর হতে একটা বিকট চীৎকার শুনতে পেলাম। সঙ্গীরা বল্লে, কেউ নিশ্চয় পা পিছলে গড়িয়ে পড়েছে। আমার আর সাবধানতা চল্ল না, যথাসাধ্য দ্রুত এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা জায়গায় কতক গুলো লোক দাঁড়িয়ে পাশের "খড়ের" দিকে চেয়ে কি বলাবলি করছে। আমিও দ্রুত সেখানে গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার অন্তরাত্মা ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল। হাত দশ বারো নীচে একটী স্ত্রীলোক অতিকষ্টে একটা পাহাড়ে লতা ধরে ঝুলছে হয় ত আর একটু হলেই সে পড়ে যাবে। আমি আরও চমকে দেখ্‌লাম সেই আমার অদ্ভুত সন্ন্যাসীটিও হাসি হাসি মুখে সেই দিকে চেয়ে আছে। কেউ কোনো রকম সাহায্য করছে না। আমি আর কোনো কথা না বলে আমার প্রকাণ্ড মুরাঠাটা খুলে ফেলে একজনকে বল্লাম "এটা ধর আমি নেমে গিয়ে ওকে উঠিয়ে আনছি।" ষণ্ডা ষণ্ডা মানুষগুলো আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল, তারা বোধ হয় এত বড় দুঃসাহস করতে কাউকে কখন দেখে নি। বিশেষতঃ দুটো মানুষকে ধরে রাখার শক্তি কারু ছিল কিনা সন্দেহ। ঐ পিছল আর সঙ্কীর্ণ পথে পা বাধাবার মত কিছুই ছিল না। কেউ যখন ঐ টুকু মাত্র সাহায্য আমায় করলে না এমন কি আস্তে আস্তে সরে পড়তে লাগল, তখন আমি ঐ অদ্ভুত মানুষটীর দিকে চাইলাম। তিনি হঠাৎ বল্লেন—মায়া—মায়া!

মায়া! হোক মায়া, আমি আর থাকতে পারলাম না তাঁর হাতে আমার মুরাঠার একটা দিক ছুড়ে দিলাম। সেও যেন

কলের পুতুলের মত সেটা চেপে ধরলে! কিন্তু কি তার শক্তি! একটু হেল্‌লেও না অনায়াসে দুটো মানুষকে টেনে ওপরে তুলে ফেলে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চলতে আরম্ভ করলে! আমিও সঙ্গ নিলাম।

কিন্তু এই আলাপে এমনি আমাদের আলাপ জমে উঠল যে সমস্ত পথটা সে আর আমায় ছাড়লে না। কিন্তু কি অদ্ভুৎ তার বৈরাগ্য কি অদ্ভুৎ তার ধৈর্য্য! পথে কত লোক অসুখে পড়ছে, কত কাতর ক্রন্দন শুনতে হচ্চে, কিন্তু কোনো দিকে তার দৃষ্টি নাই। সে অচল ধৈর্য্যে দিনের পর দিন চলেছে ত' চলেইছে। কতবার আমায় কতলোকের জন্য পথ-চলা বন্ধ করতে হয়েছে কিন্তু সে কারও কাছে সাহায্য চায়ও নি, কারুদিকে ফিরে তাকাও নি। মাঝে মাঝে যখন জিজ্ঞাসা করিছি যে যাত্রীদের সাহায্য না করা কি ভাল হচ্চে সে কেবলি হেসে বলেছে "পাপের বন্ধন যদি বন্ধন হয় পূণ্যের বন্ধন কি বন্ধন নয়? মায়া—মায়া—মায়া! আবার মায়ার বশবর্ত্তী হব কেন?"

মায়া! জীবরূপে শিব নিজে হাত পেতে ভিক্ষে চাচ্ছেন, আর আমি বলব মায়া—ভেলকি—মিথ্যে! ঐ যে মেয়েটী সাহায্য চাচ্ছেন ছেলে কোলে করে পথ চলতে পথের ধারে বসে পড়ল, তারপর তার দু বছরের ছেলেটা পথের ধারে ওলাউঠায় মারা গেল, কেউ তার দিকে চাইলে না, এইটেই কি মায়া কাটানর পথ? তবে যারা এই দুর্গম পথ সুগম করবার জন্য মাঝে চটী করে রেখেছেন, ধর্ম্ম-শালা করে রেখেছেন, তাঁরাও ত মায়ারই প্রশ্রয় দিয়েছেন। কালী কম্‌লি ত' নিজে ছিলেন পরম বৈরাগী, পরম ত্যাগী মানুষ! তাঁরই বা এ মাথা ব্যথা কেন হয়েছিল যে তিনি তাঁর শিষ্যদের দিয়ে সাধুদের জন্য এই সব আশ্রয় তৈরী করিয়েছেন?

কিন্তু সে সময় আমার এসব তর্কের কথা মনে হত না—কারণ তখন যে মায়া কাটাতেই বেরিয়েছিলাম। আমার অবাধ্য মনটা যে মাঝে মাঝে ভুল করে সেই মহামায়ার মায়াতেই আবদ্ধ হয়ে পড়ত তার জন্য লজ্জিতই হতাম। বন্ধুটী নিজের কার্য্যের দ্বারা উপদেশের দ্বারা আমার সেই ভুল কাটিয়ে দিত। তবু আমার পদে পদে ভুল হয়েছে—কত সময় পাহাড়ের ধারে বসে হিমালয়ের অপূর্ব্ব শোভায় মগ্ন হয়ে গিয়েছি, দিগন্ত বিস্তৃত তুষারের উপর সূর্য্য রশ্মির খেলা দেখতে দেখতে পথ হাঁটাই ভুলে গিয়েছি, সেই মনোরম প্রদেশের শোভায়, গাম্ভীর্য্যে আপনাকে হারিয়ে শুধু বাহিরটার মধ্যেই ডুবে গিয়েছি তবু সেই পথের বন্ধুটী আমায় ত্যাগ করেন নি। সে বাহিরের সব মায়া ত্যাগ করেছিল কিন্তু এই কুড়িয়ে পাওয়া বন্ধুটীর মায়া ত্যাগ করতে পারে নি। আমি একদিন সেই কথা বলে তাকে চমকেও দিয়েছিলাম। সেও একদিনের জন্য আমার সঙ্গ ছেড়ে পালিয়েছিল, কিন্তু তা কেবল একদিনের জন্য—পরদিন যে চটীতে পৌচেছিলাম, সেখানে গিয়ে দেখি বন্ধু আমার অপেক্ষায় একটা পাথরের ওপর চুপ করে বসে আছে। আমায় দেখে সে লজ্জিত হল, কিন্তু তারপর বুঝিয়ে দিলে, যে আমরা গুরু-ভাই, আমাদের পরস্পর সাহায্য করার দরকার। গুরু-ভাই যে কি করে হলাম তা জানিনে তবে একপথে এক উদ্দেশ্যে চলেছি বলেই যদি গুরু-ভাই হই তা'হলে ত' ঐ পথে যত যাত্রী চলেছে সবাই ত' গুরু-ভাই। কেন যে সে আমায় গুরু-ভাই মনে করেছিল তা আজও বলতে পারিনে। শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাসীর পথ অবলম্বন করেছিলাম বলে? বৈরাগ্য মেবাভয়ং এই স্বীকার করেছিলাম বলে? ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা স্বীকার করেছিলাম বলে? কেন

তা জানিনে তবু সে আমায় ভাই বলে স্বীকার করেছিল, আমিও তাকে দাদা বলে, বন্ধু বলে স্বীকার করেছিলাম, বুঝি খুব ভালও বেসেছিলাম। কিন্তু সংসার ছেড়েও, যার জন্য সংসার, সেই ভালবাসাকেই সত্য বলে স্বীকার করে ফেলেছি, মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পারি নি, এটা কিন্তু তখন সাহস করে স্বীকার করতে পারি নি।

তারপর কত কষ্ট, কত পরিশ্রমের পর কেদারে পৌঁছে, সমস্ত যাত্রীরও যে ভুল হয়েছিল, আমাদের দুজনেরও ত' সেই ভুল ঘটতে কসুর হল না। সকলেই যেমন মন্দিরের মধ্যে ঢুকে হাউ হাউ করে কাঁদছিল, আমরা দুজনেও প্রায় তেমনি করেই কাঁদতে আরম্ভ করেছিলাম। হিমালয়ের বিশাল অরূপের মাঝখানে সেই পাথরের একটা ছোট মন্দিরে পাথরেরই একটী ছোট্ট বিগ্রহ মূর্ত্তি—অথচ এই দুইটী বৈদান্তিক মানুষের প্রাণে সেই নিতান্তই ছোট্ট শান্ত বস্তু এবং সীমাবদ্ধ স্থান অনন্ত যাত্রার পরিসমাপ্তির আভাষ এনে দিলে। আমি অন্ততঃ তখন মনে মনে বলেছিলাম, "পেলাম, ওগো পেলাম তোমায় পেলাম।"

বন্ধু আমার অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তের জন্য, তার নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করলে না। তারও বৈরাগ্যের অনুরাগ তার গোপন প্রাণের চিরন্তন ভুলগুলিকে একেবারে গলা টিপে মারতে পারে নি। সেও যেন চোখের জল দিয়ে স্বীকার করলে যে, ভুলের ওপরই যেন জগতের যত সৌন্দর্য্য, যত রস, যত আনন্দ প্রতিষ্ঠিত। আমিও এত চেষ্টা করে এত পরিশ্রম করে গিয়ে যাকে পেলাম তা দুঃখ নয় দুঃখের আভাবও তাতে ছিল না। তাতে যতটুকু দুঃখ ছিল তার সবটুকুই আনন্দ,—দুঃখ নয়, দুঃখ কোথাও নেই, দুঃখ কোথাও

কখনো ছিল না ঐ শিলাময় বিগ্রহের কঠিনত্ব, ক্ষুদ্রত্ব সসীমত্বের মধ্য দিয়ে একটা অনন্ত অস্তিত্বের আভাষ পাওয়া গেল। যেন কে আমায় বলে দিলে যে, যাকে ছোট মনে করছ তারই মধ্য দিয়ে যদি বড়কে দেখতে পাও তাহলে আর ভয় কি—ভয় কোথাও নেই, কোথাও থাকৃতে পারে না। ভয়টাই মায়া, মিথ্যা—যেখানে যাও সেইখানেই এই ভয়ের মধ্যে অভয়কে দেখতে পেতে পার। যা তোমায় বাধা দিচ্ছে, যাকে নিতান্তই ছোট বলে, সসীম বলে অবজ্ঞা করছ সেই ছোট্ট নিতান্তই হাতের মধ্যেকার কঠিন পাথরটুকুই তোমার অসীমের মধ্যে প্রবেশের দরজা। প্রত্যেক বড় বস্তুই অ জড়ের মধ্যে দৃষ্টি প্রবেশের গবক্ষ।

কেদারনাথ ঐ অফুরন্ত পর্ব্বতমালার মধ্যে ছোট্ট একখানা পাথর হয়ে বসেছিলেন, অথচ সেই ছোট্ট পাথরটুকুকে ছুঁয়েই আমি "নগাধিরাজ দেবতাত্মা" হিমালয়ের স্পর্শ পেলাম। ঐ ক্ষুদ্র মন্দিরের চূড়াকে দেখতে গিয়েই আমার মনটা অনন্ত আকাশের মধ্যে পৌঁছে গেল। আমি অভয়কে পেলাম, সুন্দরকে পেলাম, আনন্দকে পেলাম।

কিন্তু কোথায় আমার চিরসাধনার চিরপ্রত্যাশিত দুঃখ-ভৈরব কোথায় গো তুমি? যা! তোমায়ত' পেলাম না? এই যাকে পেলাম, সেইতো দেখছি সর্ব্বব্যাপী হয়ে রয়েছে। আমার বাঙ্গালা মায়ের বুক হ'তে এতদূরে পালিয়ে এলাম এখানেওত' সেই "আনন্দ জপমমৃতং যদ্বিভাতি" তাই রয়েছে? তা হলে উপায়?

বন্ধুকে সে কথা বল্লাম। সে বল্লে "ছোট সুখ ছেড়ে বড় সুখকেই মানুষ চায়, দুঃখকেত' কেউ চায় না। আনন্দকে না চাইলেও সে যখন আছে তখন তাকে পেতেই হবে। এখানে

দুঃখ পেতে আসিনি সুখ পেতেই এসেছি—সুখই পেয়েছি। যে যা চায় সেইরূপেই ভগবান তার কাছে ধরা দেন—তোমাকেও দিলেন।"

আমি বল্লাম, "ভুল, আমি দুঃখ পেতেই বেরিয়েছি, কিন্তু দুঃখ কোথাও নেই বলেই ধরতে পারলাম না—সুখই আছে তাই পদে পদে সুখকেই পাওয়া যাচ্ছে।"

বন্ধু বল্লে, "মিথ্যা কথা, তোমার প্রাণ সুখ চায় তুমি তাকে একটা অদ্ভূৎ জিনিষ বোঝালে সে বুঝবে কেন? সে সুখকেই খোঁজে—সংসারে সুখ নেই তাই সে সংসারের বাইরে সুখকে খুঁজতে বেরিয়েছে, দুঃখকে ছেড়েছে তাই পদে পদে সুখকেই পাচ্ছে। সুখকে ছোট বস্তুতে বেঁধে ফেলাই দুঃখ, তুমি ভুল করেই হোক আর যা করেই হোক সুখের পেছনেই বেরিয়েছ, কারণ তোমার অন্তরাত্মা জানেন যে 'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'; তাই তুমি ক্ষুদ্রকে ছেড়ে বৃহতের দিকে অনন্তের দিকে ছুটে বেরিয়েছ। সেইজন্য সুখকেই পাচ্ছ।"

আমি বল্লাম, "সুখ যদি হয় বড় হওয়ায়, আর দুঃখ যদি হয় ছোট হওয়ায় তাহলে ত' আমার ভুল হচ্চে—আমি যখন দুঃখকেই চাই তখন আমারও ছোটই ত' হতে হবে?"

বন্ধু আমায় হেসে বল্লে, "ছোট হবার কি তোমার আর জো আছে? একবার যে বড় হওয়ার মুক্ত হওয়ার আস্বাদ পেয়েছে, সে কি, আর ফিরতে পারে? পারে না!"

"পারে না? তবে যে বিরাট সত্ত্বা এই বিশ্বকে অতিক্রম করেও অনন্ত হয়ে আছেন, তিনিই বা ছোট ছোট হয়ে ছড়িয়ে পড়লেন কেন? যে ছোট তার পক্ষে হয়তো বড় হওয়াতেই

আনন্দ। আর যে বড় তার নিশ্চয়ই ছোট হওয়াতে, নিজেকে সীমায় আবদ্ধ করাতেই আনন্দ। আমি যখন সর্ব্বব্যাপী তখন আমায় ছোটই ত' হতে হবে।"

বন্ধু বল্লে, "ভুল, ভুল তোমার কোথায় যেন মস্ত ভুল রয়ে গিয়েছে। ফিরবার মুখে গুরু মহারাজের কাছে তোমায় কিছুদিন রাখতে হবে দেখছি।"

কেদার হ'তে বদরিবিশালা তারপর গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রীর ভয়ঙ্কর দুর্গম পথ অতিক্রম করলাম। অন্নজীবী দেহ যে এত কষ্ট সইতে পারবে তার আশা আমার ছিল না। কিন্তু মানুষের শরীরে যে কত সয় তার প্রমাণ নিয়ে যখন সংকল্প করলাম, মানস-সরোবরে যাব, তখন বন্ধু আমার হাত চেপে ধরে বল্লে, "এখন কাজ নেই ভাই, আগে চল গুরুদেবের কাছে গিয়ে দেহ আর মনটাকে তৈরী করে' নাও তারপর মানস-সরোবরেই হোক আর যেখানেই হোক যেও।"

আমি বল্লাম "কষ্টের ভয় করছ? কষ্টকেইত' আমি চাই—আমার কোথাও গিয়ে বসা হবে না।" বন্ধু আমার কাতর হয়ে ব'ল্ল, "না ভাই না, মিছি মিছি কষ্ট পাওয়ার দরকার নেই। উদ্দেশ্যহীন কৃচ্ছ কোনো ফল দেবে না। আগে সত্যকে, উদ্দেশ্যকে ঠিক করে নাও তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। যোগের দ্বারা দেহকে, সমাধি দ্বারা বুদ্ধিকে শুদ্ধ করে না নিয়ে এখন কোনো কাজ করা হবে না এই ক'মাসে তোমার শরীর খুব খারাপ হয়েছে—এখন একটু বিশ্রামের প্রয়োজন।"

আমি তর্ক করলাম বটে, কিন্তু হতভাগা দেহটা বন্ধুরই অনুসরণ করলে এবং কিছুদিনের মধ্যেই কণখলে ফিরে এসে আমার বন্ধুর

গুরুদেবের আশ্রমে উপস্থিত হল। তারপর যা আরম্ভ হল তার বিশেষ বর্ণনা করে কি করব। এই পথে বেরিয়ে সবাইকে যা করতে হয় তার সমস্তই আমায় করতে হল। সম, যম, দম, নিয়মের সমস্তই পালন করলাম, নিজের শ্রাদ্ধ নিজেই শেষ করলাম। তারপর ছ-মাস ধরে একটা ছোট ঘরের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ করে শরীরটাকে এমন শুকিয়ে তুল্লাম যে নিজেই নিজেকে চিনতে পারতাম কিনা সন্দেহ। আহার সংযম করতে করতে প্রায় অনাহারে গিয়ে ঠেকেছিল। তারপর ক্রমশঃ সেটাকে বাড়াতে বাড়াতে যখন স্বাভাবিক আহারে এনে পৌঁছালাম তখন আমার শরীর যেন একটা কিসের তেজে অন্তর-বাহিরে জ্বলতে আরম্ভ করেছিল। একটা তত্ত্বকে আর একটা তত্ত্বে মিলুতে মিলুতে— সংসারটা যে ভুয়ো এবং আমি যে প্রায় সেই ভুয়োর সামিল, একটা অস্তিত্বমাত্র এই জ্ঞানটা আগুণের অক্ষরে নিজের ওপর লিখে ফেলেছিলাম। বন্ধুই কেবল আমার সঙ্গে দেখা করতে পেত আর কেউ নয়। এই একান্ত বাসের ফলে যখন আমার মনটা মাঝে মাঝে বিদ্রোহী হয়ে উঠত তখন সে এসে সাহস না দিলে, বল না দিলে, বিশেষতঃ তার সঙ্গটুকু না দিলে হয়ত একদম শুকিয়ে মরেই যেতাম। কিন্তু এমনি করে সংসারটা মিছে করে তুলেও সেটার যখন কিছুতেই অন্ধকার মর্‌ল না, তখন গুরু আমায় নবরাত্রি করালেন। নয় দিনের জন্য একটা ঘরের মধ্যে একদম একলা বন্ধ করে রাখ্‌লেন। সেই নয় দিনের পর আমি হোম শেষ করে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন আমার শরীরটাও যেমন ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল, সারা সংসারও যেন তেমনি প্রাণহীন ফ্যাকাসে মেরে গিয়েছিল।

কিন্তু বন্ধু আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "বাঃ তোমার মুখ দেখেই বুঝতে পারছি তুমি লব্ধকাম হয়েছ। আজ জোর করে বলতে পারি তোমার পূর্ণ সন্ন্যাস হয়েছে, আজ তোমার 'কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা' তোমার জন্মও সার্থক।"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না—কিন্তু আমার অন্তরের অন্তর হতে কে যেন বল্লে—'আর পারিনে'। আমি উদাসভাবে বন্ধুর দিকে চাইলাম, প্রভাতের আকাশের দিকে চাইলাম, তারপর ফিরে দূরে যেখানে হিমগিরি তুষারের আভাসে চক্‌মক্ করছিল সেদিকে চেয়ে রইলাম। কি যে সারা সংসার আমার কাণে বলছিল তা মনে নেই, কেবল এইটুকু মনে আছে, যে, সমস্তই যেন ছায়া ছায়া! ছায়া ছায়া ছায়া ছায়া—সত্যও নাই মিথ্যাও নাই, আমি আছি কিনা যেন তারও ঠিক নাই।

তাই বলে এটাও সত্য নয় যে এই কৃচ্ছের মধ্যে এই ধ্যান ধারণা সমাধির মধ্যে কোনো সুখ পাইনি। বরঞ্চ ঠিক তার উল্টোই হয়েছিল, এমন একটা ভয়ানক মাদকতা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনা আমাকে পেয়ে বসেছিল যে আমি এক মুহূর্ত্তও অপব্যয় করিনি। এই ইন্দ্রিয়নিগ্রহাদির মধ্যে এই ভয়ঙ্কর শুষ্কতার মধ্যে এমন একটা নেশার জিনিষ ছিল যার প্রচণ্ড সুখ ত্যাগ করতে প্রাণ চাইত না, কেবলই ভয় হত পাছে এই কৃচ্ছের, এই সুখময় দুঃখের শেষ হয়ে যায়। এই যে চব্বিশটা তত্ত্বকে নিয়ে রাতদিন খেলা করা, এর মধ্যে কেবল যে তত্ত্বানুভবের সুখ ছিল, তা নয়, একটা প্রচণ্ড আত্মানুভূতি আত্মকর্তৃত্বানুভবের সুখে আমায় মাতাল করে তুলেছিল। আমিই একমাত্র 'অচলং' ধ্রুবং' বাদবাকী সমস্তই চঞ্চল ও পরিণামী। এই অচল আমিকে পূর্ণভাবে অনুভব করে

আত্মরসে বিভোর হওয়ার মধ্যে যে সুখ ছিল সে সুখের সঙ্গে কোন্ সুখের তুলনা করব? গীতা বলেছেন—'অত্যন্তং সুখমুশ্নুতে'—

কিন্তু সেই সুখ যে কতখানি তার অনুভূতি নিজে না করলে কিছুতেই বোঝাবার জো নেই। অথচ নিজ বোধগম্য সেই রসে আমার চিত্ত যেমন একদিকে সরস হয়ে উঠেছিল—তেমনি আর একদিকে সে যে প্রচণ্ড শুষ্কতা অনুভব করছিল, এ কথা প্রথম প্রথম উৎসাহের ঝোঁকে বুঝতে পারিনি। ক্রমশঃ মনের একটা দিক যতই আত্মবশ হয়ে "ন কিঞ্চিদপি" চিন্তায় বিভোর হয়ে উঠছিল আর একটা দিক তেমনি একটা ভীষণ একত্বের শুষ্কতায় পরিত্রাহি চীৎকার আরম্ভ করেছিল। একদিক দিয়ে যেমন প্রচণ্ড সুখকে অনুভব করেছিলাম আর একদিক দিয়ে তেমনি সজোরে আমার সেই চিরকালকার আশার বস্তুর সঙ্গে—দুঃখের সঙ্গে, অভাবের সঙ্গে পিঠাপিঠী ভাবে আপনাকে অনুভব করেছিলাম। অথচ সে কথাটা ধরতে পারিনি; বুঝতে পারিনি—কিসের অভাব? কার অভাব? আমি যখন সমস্ত বহুত্বকে অখণ্ড একত্বে পরিণত করছিলাম তখন কিসের চিরন্তন ক্রন্দন আমার পিছনে লেগেই ছিল? সেই মহাসুখের পেছনে যে দুঃখ বিপরীত মুখে বসেছিল, সে কে গো? তাকেত' কেউ দেখিয়ে দিলে না?

গুরু বলে দিলেন, সেই হচ্চে অনাদি মায়া, সেই হচ্চে আত্মার আদিম ভ্রম, মূলস্থ প্রবৃত্তিমূলক ভ্রান্তি। ভ্রান্তি? হবে। কিন্তু আমার আত্মা তা মানছে না কেন? সে কেন কেবলই বলছে যে একের দিকে চাইলে আমিকে এক ছাড়া, অস্তিমাত্র ছাড়া আর কিছু বলেই ধারণা হবে না। আমির দিকে চাইলে সমস্ত তুমি সমস্ত ইদং এক অখণ্ড অস্তিত্বের

মধ্যে মিলিয়ে যাবেই।—আবার তুমির দিকে চাইলে, বাইরের দিকে চাইলে কিছুতেই বহুছাড়া অসংখ্য ছাড়া "এক" দেখা যাবে না। অথচ এই "এক" এবং "বহুর" মধ্যে কোথায় যে একটা পরম যোগ আছে তা এই প্রচণ্ড একীকরণ যোগের দ্বারাও ধরা যাচ্ছে না। বা বাহ্যজগতে জাগ্রতজগতের বহুত্বাভিমুখী বিভ্রম যোগের দ্বারাও ধরা যাচ্ছে না। যদি সাংখ্যযোগের এই একত্বাভিমুখী চেষ্টাকে আত্মার সত্যোপলব্ধির চেষ্টা বল, তাহ'লে সেই আত্মার এই সংসারাভিমুখী, বহুত্বাভিমুখী স্বাভাবিক চেষ্টাকেই বা ভ্রমাত্মক বল কেন? হয়ত এই দুই চেষ্টাই সত্য। হয়তো যোগের দ্বারা একত্বের অনুভবও যেমন সত্যকে অনুভব করা, মায়াধীনভাবে বাহ্যজগতে বহুকে অনুভব করাও তেমনি সত্যকেই অনুভব করা। যিনি পরম এক তিনিই হয়ত নিজের একত্বের মধ্যে বহুত্বকে অনুভব করতে না পেরে আমারই মধ্য দিয়ে বহুত্বকে অনুভব করছেন। কে জানে এই দুইভাবেই সত্যের উপলব্ধি হয়ে চল্‌ছে কিনা।

আমার এই সব সন্দেহের উত্তর পেলাম না, কেউ দিলে না বা দিতে পারলে না। কিন্তু গুরু আমার কথা শুনে বল্লেন, "তোমার এই সন্দেহই হচ্ছে তোমার অস্তিত্বের কারণ, তুমি এই সন্দেহ যে উপায়ে পার দূর কর। আমার কাছে থেকে এর উত্তর পাবে না—আমি যতদুর জানি তোমায় দেখিয়ে দিয়েছি। এখন তোমার যা ইচ্ছে তাই কর।"

আমি গুরুদেবের পায়ে প্রণাম করে বল্লাম, "আপনি আমায় যা দেখালেন তার দাম যে কত তা কেমন করে জানাব? আত্মা হতে, জগৎ সৃষ্টির জ্বলন্ত অনুভূতিই যে মানুষ প্রতিনিয়ত ভুলছে।

সেই ভুলটাকেও যে দূর করার দরকার, নইলে যে কিছুই হতোনা। আমার মনের একটা দিকের অন্ধকার দূর করে দিয়ে আপনি যে উপকার করলেন তার উপযুক্ত দক্ষিণা কোথায় পাব? তার দক্ষিণা আপনার শ্রীচরণ নিরন্তর স্মরণ দ্বারা যতটুকু দিতে পারি তাই দেব। আমার একটা সন্দেহ দূর হয়েছে বটে কিন্তু আর একটা যে নিগূঢ় সন্দেহ জেগেই রয়েছে তাও আমায় দূর করতে হবে। আত্মকর্তৃত্বের ওপর যেমন আমার প্রচণ্ড বিশ্বাস জন্মেছে, আত্মা ছাড়া আর কিছু নেই যেমন অন্তরে অন্তরে বুঝতে পেরেছি, তেমনি বাইরেই বা কেন অত অসংখ্য তুমিত্বের ধারণা হচ্চে এরও একটা শেষ মীমাংসা আমাকেই করতে হবে। আপনি আমায় সাহস দেন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন এতত্ত্বেরও মীমাংসা আমাতে ফুটেওঠে।"

গুরু আশীর্ব্বাদ করলেন। আমিও তাঁর নিকট হতে বিদায় নিয়ে বন্ধুর কাছেও বিদায় নিলাম। বন্ধুকে বল্লাম যে যদি এ তত্ত্বের মীমাংসা—এই প্রচণ্ড তুমি তত্ত্বের মীমাংসা, করতে পারি তা হলে নিশ্চয়ই তাকে সে তত্ত্ব বোঝাব। সেও হেসে বল্লে—"মায়া—মায়া—অনাদি মিথ্যা—

জ্ঞানীনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি।

তোমার দেখছি এ মায়ার হাত হতে নিস্তার নেই।"

আমি উদাস ভাবে বল্লাম "হয়তো নেই—হয়তো কারুরই নেই। তোমারও নেই আমারও নেই হয়তো গুরুদেবেরও নেই।"

বন্ধু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বল্লে—"আমিও বেঁচে থাকব, আবার দেখা হবে, নিশ্চয়ই হবে। তখন কি বল শুনবার জন্য উৎসুক হয়ে রইলাম।"

৫

তারপর আবার ঘূর্ণীপাকে দু'বৎসর ধরে ঘুরলাম। কিন্তু সেই প্রচণ্ড ঘূর্ণীর মধ্যে কি যে পেলাম, কি যে হারালাম তার জমা খরচ দিতে পারব না ; সময় সেই, কারণ আবার সেই ঘূর্ণায় আমায় পেয়ে বসেছে। দু'দিন নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে এসে আবার আমায় সেই আদিম ঘূর্ণায় পেয়ে বসল। যতদিন না এই ঘূর্ণার শেষ হয় ততদিন বুঝি আমার শান্তি নেই স্বস্তি নেই। হয়ত স্বস্তি এই জগতেই নেই হয়তো আমার জীবনে চঞ্চলতার মধ্যে অচঞ্চলত্বের অনুভবই সত্য তাই অচঞ্চলত্বের মধ্যে নিজেকে রাখতে গেলেই আমায় ছুটে বেরুতে হবে।

যাই হোক আমি গুরুচরণ হতে বিদায় নিয়ে নিতান্তই একলা হলাম। অথচ যেখানেই গিয়েছি, যতই আমি ছাড়া আর কেউ আছে কিনা প্রমাণ নেবার জন্য দূরে দূরে, পর্ব্বতে কন্দরে, মরুভূমে বেড়িয়েছি ততই যেন সেই মহান দ্বিতীয়ের অনুভূতি পদে পদে হয়েছে। এমন কি কতবার পশুপক্ষীতে আমায় রক্ষা করে প্রাণ বাঁচিয়ে প্রমাণ করে দিয়েছে যে আমারই সঙ্গে আর একজন বহুরূপে আমায় রক্ষা করে, আমায় সাহায্য করে, ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেন আমারও যেমন শান্তি নেই—স্বস্তি নেই, তারও যেন আমারই জন্য শান্তি নেই স্বস্তি নেই। এই ভবঘুরে মানুষটীর জন্য সেও যেন ভবঘুরে হয়ে পড়েছে। তাই বাঘ ভালুকে আমার দেহটাকে খায়নি, এমন কি বনের বাঁদরে আমাকে মরণ হতে রক্ষা করেছে। এমনি করে প্রত্যক্ষভাবে বাইরে আর একজনকে অনুভব করা—পূর্ণভাবে বাইরে না বেরুলে কি অনুভব করতে পারতাম?

কখনো না। পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে না ঢুকলে যেমন আপনাকে অনুভব করতে পারিনি তেমনি পূর্ণভাবে আপনাকে ছেড়ে না দিলে এমন করে "পূর্ণ তুমি"র অনুভব কি আমার হত? আমার মনে হয়—হতনা। কিন্তু এই তুমির সঙ্গে আমার যোগ কোথায়? কে এদের এক করছে—পরস্পর পরস্পরকে অনুভব করাচ্ছে? তা যে কিছুতেই ধরতে পারছিনে।

এমনি ভাবে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমার একত্ব যখন আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল, তখন হঠাৎ কে যেন বলে উঠ্‌লে "ওরে ফিরে চল, কোথায় যে তোতে আমাতে মিল—দেখতে পাবি!"

কিন্তু কোথায় ফিরব? ক্রমাগতই ত ঘুরছি, ফিরছি, আবার কোথায় ফিরব? তবু সেই অনাহত ধ্বনি ক্রমাগত হতে লাগল, "ফিরে চল—ফিরে চল।"

এই সময় মানুষ হতে এত দূরে গিয়ে পড়েছিলাম, যে কাকে জিজ্ঞাসা করব, যে কোথায় ফিরতে হবে, তার উপায় ছিল না। অথচ দিনের পর দিন এই সাড়ে তিনহাত লম্বা ভ্রমে ডোবা মানুষকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠ্‌তে লাগল।

তারপর পাহাড়তলিতে পৌঁছে যে দিন প্রথম মানুষের মুখ দেখলাম, সেদিন যে কি আনন্দ পেয়েছিলাম তা বলতে পারিনে। মানুষের মুখে এত শোভা, এত সুখ, এত আকর্ষণী শক্তি আছে! আমি সমস্তদিন ধরে একটা গাছের তলায় বসে মানুষ দেখতে লাগ্‌লাম।

আমার একত্বই দুঃখ—আমার বহুত্বই সুখ যাদের দেখ্‌ছিলাম, তারা ছিল ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বনকাটার দল। তারা একটা

সন্ন্যাসীকে তাদের তাঁবুর কাছে চুপ করে বসে থাকতে দেখে কি মনে করেছিল জানি না—কিন্তু আমি কিছু না চাইতেই দেখ্‌লাম আমার কাছে ধুনি জ্বালা হল, ভাল রুটী পাকান হল—কত ফল পাকড় এসে জুটে গেল। আমি না চাইতেই মানুষ আমায় আদরকরে ভালবেসে ভক্তিকরে আপনার করে নিল। হায় রে এই মানুষকে মায়ার জীব বলে,—ঘৃণার জীব বলে দূরে পালিয়েছিলাম।

কি আছে এই মানুষের মধ্যে? কোথায় এই মানুষের সঙ্গে আমার যোগ? কি আমি এদের মধ্যে পাচ্ছিলাম তাই চুপ করে বসে সময় কাটাচ্ছিলাম? কাকে পাচ্ছিলাম? কে সে? আমি নিজে—না আর কেউ? আমার এ সব প্রশ্ন সে সময় উদয় হয়নি, কিন্তু তারপর যখন ক্রমশঃ আবার মানুষের মধ্যে ঘুরতে আরম্ভ করলাম তখন ক্রমাগতই এই প্রশ্ন জেগে উঠতে লাগল। আমি মানুষের সঙ্গ ছেড়ে পশু পক্ষীর মধ্যে যেন আপনাকেই হারিয়ে ফেলেছিলাম। এই আপনার সঙ্গে প্রকৃতির যেন একটা সম্পূর্ণ মিল হয়ে গিয়ে না সুখ না দুঃখের একটা অ-জল অ-স্থলের মত স্থানে পৌঁছে গিয়েছিলাম। তারপর যাই আবার অমারই মত কতকগুলা জীবের মধ্যে এসে পড়লাম তখনি আমার 'আমি'ও প্রবুদ্ধ হয়ে উঠল, জগৎও জেগে উঠল। আমি তখন আবার পাগলের মত ছুট্‌তে লাগলাম। সে যে কি আনন্দে, কি সুখে আমায় ঠেলে নিয়ে চলেছিল তা কি কাউকে বোঝাতে পারব?

এই রকম অবস্থায় আমি এই প্রয়াগে এসে উপস্থিত হয়েছি। পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য নয়, সন্ন্যাসী দর্শনের জন্য নয়, কারুর কাছে কোনো উপদেশ নিতে নয়—শুধু এই মহামেলায় মহামানুষকে

অনুভব করতে। মানুষের মধ্যে আপনাকে অনুভব করতে আর আমার পাশে চির-দ্বিতীয়কে অনুভব করতে।

কিন্তু এখানে এসে একি করে বসলাম? আমার এত দিনকার সমস্ত বৈরাগ্য, এত দিনকার সমস্ত চেষ্টা, সাবধানতা সব ভাসিয়ে দিলাম। এ আমি কি করলাম? এক মুহূর্ত্তের ভুলে—প্রলোভনে নয়, ভুলে-ভুলে—এ আমি কি করলাম? এ আবার কাকে আমার একক জীবনের মধ্যে এনে দাঁড় করালাম? সে বালিকা ত' কিছুই জানেনা, তার কেন এই সর্ব্বনাশ করলাম? সে এখন কিছুই বুঝতে পারছে না, কিন্তু হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই কিছুদিন পরেই বুঝতে পারবে তার কি সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে? একটা অদ্ভুত খেয়ালের বসে তার পিতাই তার কি ক্ষতি করেছেন!

কিন্তু আমিই বা কেন সেই অদ্ভুৎ মানুষটার কথায় ভুল্‌লাম। মানুষকে অত্যন্ত কাছে—একেবার প্রাণের মধ্যেই যদি অনুভব করবার ইচ্ছা ছিল, তাহলে সেই পাঁচ বৎসর আগেই ত' তা করতে পারতাম। যখন সমাজের মধ্যে, আত্মীয়ের মধ্যে, স্নেহ ভালবাসার মধ্যে ছিলাম তখন কেন আপনাকে ধরতে পারিনি? ছি—ছি একি করলাম?

প্রয়াগে এসে এই যে ঘটনা ঘটে গেল এর জন্য কাকে দোষ দেব? আমাকে? আমাকেই? আমি কি এই অদ্ভুৎ মানুষটীর মাথায় এই অদ্ভুৎ খেয়াল ঢুকিয়ে দিয়ে ছিলাম? সে যে আজ ক'বছর হতে মনের মত সন্ন্যাসী খুঁজে বেড়াচ্ছিল; উপদেশের জন্য নয়, সাধু সঙ্গের জন্য নয়—জামাই করবার জন্য। এই ঘটনার ওপর কি আমার কোনো হাত ছিল? তারপর আমিও যে, "একটা মানুষ একটা নিতান্তই আমার আপনার মানুষের

জন্য" পাহাড়পর্ব্বত, নদীনালা অতিক্রম করে এখানে এসে পড়েছি, এটার ওপরেও কি আমার হাত ছিল? কৈ তাত বুঝতে পারছি নে?

তবে কেন এই ঘটনার জন্য আমার এত অস্বস্তি হচ্ছে? এই যে ছোট্ট একটা মানুষকে হাতের গোড়ায় পাওয়া, এই যে আমাকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে আমার ধর্ম্মাধর্ম্ম, পাপপুণ্য, সাধন ভজন, সব বিলিয়ে দিয়ে কেবল আর একজনকে অনুভব করা বিশ্বানন্দের প্রতীকরূপে ধরে ছুঁয়ে পাওয়া এইটাই যদি আমার এ জগতে আশা—এই কথাই যদি সত্য হয় তাহ'লে কেন এতদিন এই রকম করে মিছে ঘুরে মরলাম? কেনই বা এত কৃচ্ছ,এত সাবধানতা, এত ছুটোছুটী-হাঁটাহাঁটী করে মলাম? সবই যদি আবার রমণী চরণে ঢেলে দিতে হবে তবে কেন বাল্যকাল হতে এই মেয়েমানুষকেই নরকের দ্বার বলে বুঝতে চেষ্টা করে এসেছি? কেন—কেন? মানুষের সেই অনাদি ভ্রম যদি আবার আমায় করতেই হবে তবে কেন এতদিন ঘুরে মরিছি?

যাক্—যাক্—এই কেনর উত্তর নিতে আবার আমি বেরুব। কিন্তু তার পূর্ব্বে আমার এতদিনকার সমস্ত চেষ্টার একটা ছোট রকম বিবরণ লিখে রেখে যাচ্ছি। কার জন্য? তারই জন্য—যে নির্দ্দোষী বালিকা আমার এবং তার পিতার খেয়ালের কাছে আপনাকে অজ্ঞাতে বলি দিলে।

অজ্ঞাতে? তাকে কি এই রকম একটা ব্যাপারের জন্য এতদিন ধরে তৈরী করা হয়নি? তা যদি না হবে তা হলে তার মুখ দেখে তার কথাবার্ত্তা শুনে আমারই বা হঠাৎ এ রকম স্খলন হল কেন? তার ঐ সুন্দর মুখের মধ্যে প্রাকৃতিক নারীত্ব

ছাড়া আরও যে কি একটা দেখতে পেলাম। সেটা কি ভুল? হবে। যাই হোক সেই বালিকার কাছে আমার একটা কৈফিয়তের প্রয়োজন আছে! সে হয়তো আমায় এখন বুঝতে পারবে না চিরদিনই সে কিছু ষোড়শীই থাকবে না। সেও বড় হবে। তখন সে মনে মনেও অন্ততঃ আমার এই অদ্ভুৎ কার্য্যের জন্য কৈফিয়ৎ চাইবে। সেই ভবিষ্যতের জন্য এই কথাগুলো লিখে রেখে যাচ্ছি।

কিন্তু তখনো যদি সে না বোঝে? নাই বা বুঝলে তবু আমায় লিখে যেতে হবে। তাকে বুঝিয়ে যেতে হবে যে যদি সে সন্ন্যাসীকে বিয়ে করবার জন্যই জন্মদিন হতে প্রস্তুত হয়ে এসে থাকে, তা হলে তার স্বামী চিরদিনই সন্ন্যাসী থাকবে। তাকে কোনোদিনই হাতের গোড়ায় পাওয়া যাবে না। হাতের মধ্যে পেলেই তার স্বামীর সন্ন্যাসীত্ব থাকবে না।

স্বামী? কে স্বামী? কার স্বামী?—আমি তার স্বামী? এতবড় মতিভ্রম আমার ঘটে গেল? তার কাছে নিজেকে নিবেদন করতে এসে তারই ওপর নিজের একটা স্বত্ব স্বামিত্বের অভিমান লাভ করে বসলাম? এই হল এতদিনকার সাধন ভজনের ফল? ওগো কে তুমি আমার আড়ালে বসে এতবড় ক্ষতি করলে? আমার আত্মাভিমানের মাথায় এমনি করে বজ্রাঘাত করে আবার এ কোন অভিমানের জন্ম দিলে? তোমার সঙ্গে যে কিছুতেই পেরে উঠ্লাম না। সবই মনে হচ্চে আমি করছি, কিন্তু তারপরই দেখছি কিছুই ত' আমি করিনি, সবই যেন গোপনচারী তোমারই কাজ? আমার আড়ালে তোমার বিদ্রূপের হাসি বেশ শুনতে পাচ্ছি। ওগো হেসোনা গো হেসনা।

দয়া কর, বুঝিয়ে দাও,—সাহস দাও,বল যে এ কাজ আমি করিনি। বল, "এ ভুল তোমার নয়—আমার। তোমারই মধ্যদিয়ে আমিই এ ভুল ইচ্ছে করে করছি। শতভাবে, সহস্রভাবে, অফুরন্তভাবে, এই ভুল আমি করে আসছি—আমি করব। তোমার কি সাধ্য আমার এই অফুরন্ত ভুলকে নিভু´ল করে দাও।"

বুঝবে কি তুমি? এমনি করে ভালবেসে বুকের মধ্যে প্রাণের মধ্যে আত্মার কাণে কাণে এ কথা বলবে কি?

যাক্, কি কথা লিখতে কি কথা লিখে বসলাম। ওগো কিশোরী, তুমি যে দিন এই খাতাখানা খুলবে, সেদিন যেন এমনি একটা দিন হয়। সেদিন যেন এমনি ভয়ঙ্কর কাঠফাটা রৌদ্রে দিগদিগন্ত অত্যন্ত পরিস্কার সত্যের মত নির্ম্মম নিষ্ঠুর এবং স্পষ্ট হয়। যেন তোমার অন্তরে বাইরে কোথাও কোনো ছায়া না থাকে। কোনো কোমলতা না থাকে। সেদিন যে বাতাস বইবে তাতে যেন মলয়ের আভাস না থাকে, পাখীর গান না থাকে, বসন্তের কোনো আয়োজন না থাকে। যেন এমনি বৈশাখের বিরাট শুষ্কতার মধ্যে আমার সঙ্গে তোমার প্রথম পরিচয় হয়। আমি আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি যেন সেদিন তোমার মধ্যে তুমি ছাড়া আর কারো অনুভূতি না থাকে।

আমি বিদায় নিলাম। চিরদিনের জন্যই বিদায় নিলাম—অন্ততঃ এই বিদায় যেন চিরবিদায় হয়। তুমি মুক্ত—সম্পূর্ণ মুক্ত! তোমার আমার মধ্যে কোনোদিন কিছু হয়নি। খেয়ালের বসে তোমার খেয়ালী পিতা যা করলেন, তা তোমার কাজ নয় তাতে তোমার কোনো হাত ছিল না। সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিবাহ হয় না—শাস্ত্র এ বিবাহ মানবে না—মানতে পারে না। সমাজও মান্‌বে না—তুমিও

মেনো না। আমি ও মানব না—অন্ততঃ না মানতেই চেষ্টা করব। তবু যদি সময় সময় তোমায় মনে পড়ে ত'দুঃস্বপ্ন বলেই মনে করতে চেষ্টা করব।

আমি আন্তরিক এই কথা বলে গেলাম। আর, তুমি যাতে বিশ্বাস কর সেইজন্যই এই খাতাখানা, এই দিনে দিনে বেড়ে—ওঠা মনের বোঝা খানা তোমার কাছে ফেলে দিয়ে গেলাম। তুমি এর ধূলো ঝেড়ে সারটুকু গ্রহণ কর—আর অসার যা কিছু আছে ঘরের বাইরে ফেলে দিও।

আমিও আমার সমস্ত পুরাতন জীবনকে এই এতকালের সঙ্গীটার সঙ্গে তোমার পায়ে ফেলে দিয়ে নূতন বাসে নূতন আশায় বেরিয়ে পড়লাম।

ওঁ শিবমস্তু ওঁ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিপ্রলব্ধার কথা

১

বাবা আমার নাম রেখেছিলেন জানকী। কিন্তু মা আমার সে নাম উল্টে দিয়ে রাখলেন উর্ম্মিলা, তবু ভাগ্য কি তাতে উল্‌টিয়েছে? জানকী নাম বলে, রাখতে নেই, জন্ম দুঃখী হয়; কিন্তু উর্ম্মিলাই বা কি এত ভাল! মা জানকী ত' তবু তাঁর স্বামীর সঙ্গে চৌদ্দ বছর বনে বনে কাটাতে পেরেছিলেন, আমায় যে উর্ম্মিলার মত স্বামীকে পেয়েই হারাতে হয়েছে! মা আমার ভাগ্যটাকে যেন দিব্য চক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন তাই আগে থাকতেই নাম বদলে দিয়েছিলেন। তবু বাবা ডাকতেন, "মা জানকী," এবং আমিও উত্তর দিতাম। কারণ আর যে যাই মনে করুক, আমি আমার বাবাকে জনক ঋষির চেয়ে কম ভক্তি করতাম না, করতে শিখিও নি, এবং সেই জন্য নিজেরও জানকী হবার পক্ষে আপত্তিও তেমন ছিল না।

মাও যে বাবাকে কম ভক্তি করতেন তা নয়, তবু কেমন যেন তাঁর ভয় করত। আমায় সীতাদেবীর মত যে বাল্যকাল হতে শ্রীরামচন্দ্রের জন্যই উৎসর্গ করে রাখা হয়েছিল, এটা মা যেন সইতে পারতেন না। কেবলি ভয়ে ভয়ে থাকতেন। কাজে কর্ম্মে সব সময়ই আমাদের গৃহ-দেবতা রামসীতার চরণে তুলসী দিয়ে আমার বাবার অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতেন।

কিন্তু বাবার শরীরে মনে কাজেকর্ম্মে কোথাও ভয়ের লেশ মাত্র ছিল না। উনি মাকে যখন তখন বুঝিয়ে দিতেন যে, "আমার জানকীর জন্য শ্রীরঘুনাথজী নিশ্চয়ই জন্মগ্রহণ করেছেন ; তিনিই আমার মা জানকীকে পায়ে টেনে নেবেন।" মা শিউরে উঠতেন, কিন্তু আমার জ্ঞান হওয়ার পর হতে মনে পড়ে আমি কখনো ভয় পাই নি! আমি কত সময় দোতালার ছাতে উঠে আমাদের গ্রামের "সরান" পথটা যেখানে মাঠের মধ্যে মিলিয়ে গিয়েছে, সেই দিকে চেয়ে আল্‌সে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। ভাবতাম আমার সেই রামচন্দ্র ধুলো উড়িয়ে, পতাকা উড়িয়ে তাড়কা বধ করে কোন দিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হবেন।

বাবার এই ভাবটায় আমাদের যে কি রকম পেয়ে বসেছিল তা যে শুনবে সেই অবাক হয়ে যাবে। এমন কি বাড়ীর দারোয়ান ঘনবরণ সিং উৎসাহের চোটে একদিন নিজের নামটাই বদলে ফেলেছিল। ছিল ঘনবরণ হয়ে গেল রামচরণ। আর এমনি তার হাড়ে হাড়ে রামভক্তি বিঁধে গিয়েছিল যে, সে যা কিছু ছাপার অক্ষর সম্মুখে পেতো সবই রামপক্ষে ব্যাখ্যা না করে ছাড়ত না— এমন কি হনুমানজীর লেজটুকু পর্য্যন্ত বাদ যেত না। তার একদিনকার একটা ব্যাখ্যা আমার এখনো বেশ মনে পড়ে। কোথা হতে আমাদের গাড়োয়ান ছেদীলাল এক টুকরো কাগজ নিয়ে এসে দারোয়ানজীকে ধরে বসলে, "দারোয়ানজী, ইঠোতো দেখিয়ে, ইসকো মৎলব তো বাৎলাইয়ে।"

দারোয়ানজী তাঁর তুলসী দাস হতে চোখ তুলে, কাগজ খানা হাতে নিলেন। তারপর প্রায় কাঁদো কাঁদো সুরে বল্লেন, "আরে ইয়ে তো বাংলে হরফমে সংস্কৃৎ হায়—রামো লক্ষ্মণম্ ব্রবীৎ।"

"মতলব কেয়া ?"

"রামো রামচন্দ্র রঘুনাথজী ; লক্ষ্মণ, লছমনজী সমঝা ?"

"হাঁ মহারাজ, উ তো সমঝা, উস্‌কে বাদ ?"

"অব্রবী ইসকো মৎলব অলবৎ মা জানকী হোগা আউর ওহি যো হলন্ত ত হায়নু, ওহি হায় মহাবীরজীকো ডুম্ (লেজ)।"

আমাদের দারোয়ানজীর ব্যাখার অসাধারণ ক্ষমতা আগে হতেই সবাই জানতো, তাই আমাদের কোন আত্মীয়ের মুখ হতে ক্রমশঃ পাঁচ হতে হতে শেষে বাবার কাণেও পৌঁছেছিল। আমরা চেপে চেপে হাসাহাসি করছিলাম বটে, কিন্তু বাবা দারোয়ানজীরই দিক নিয়ে বলেছিলেন, "ভক্তি করে যা মানে করবে তাই ঠিক হবে ; তোমরা কেউ হেসো না।"

জোরে হাসবার কারো তেমন জো ছিল না, কারণ একে আমাদের বাড়ী হল গ্রামের জমিদার বাড়ী। তার ওপর এমনি একটা আচার অনুষ্ঠান, পূজা পার্ব্বন, শাস্ত্র পাঠ, অতিথি সেবার হাওয়া সারা বৎসর ধরে বাড়ীতে বইত যে হাসি ঠাট্টা বাড়ী হতে প্রায় বিদায় নিয়েছিল। এমন কি যাত্রা গান কথকতা বা কীর্ত্তন যাই কিছু হোক না কেন সমস্ত আনন্দের জিনিষের মধ্য হতে হাসির অংশটুকু বাদ না দিলে যেন আমাদের চণ্ডিমণ্ডপে সে সবের স্থান হত না।

আমি জমিদারের মেয়ে, তাই চাকর দাসীরও অভাব ছিল না, খেলার সাথারও অভাব ছিল না। কিন্তু বন্ধু বলতে যা বোঝায়, সখী বলতে যা বোঝায় তাত ছোট বেলা কৈ কখনো পাইনি। যাকেই অন্তরঙ্গ করতে গিয়েছি সেই যেন কেমন একটুখানি দূরত্ব রেখে তবে কাছে এসেছে। আমি যেন কোন একটা অচেনা

জগতের জীব, কি এক অজানা কারণে, বোধ হয় শাপ ভ্রষ্ট হয়ে সংসারে এসেছি। আমার সঙ্গে ভাল করে, প্রাণ খুলে যেন মিশতে নেই! সবারই পক্ষে আমার কথা শুনতে আছে, কাজ বললে তৎক্ষণাৎ করে দিতে আছে, আমার ঘরে ধূপ ধূনো, ফুল চন্দন সবই দিতে আছে, কেবল আমার গলা জড়িয়ে ধরে ছুটো মানে-মৎলবহীন মিষ্টি কথা বলতে নেই।

এই জন্য আমার মধ্যে ছোটবেলা হতেই এমন একটা জীব জেগে উঠেছিল যা একেবারেই এ দেশের নয়, সে জন্তু কি দেবতা তা এখনো ঠিক করতে পারিনি। সে কখনো চাইত ছুটে বেরিয়ে নেচে কুঁদে অস্থির হয়ে সব শুচিত্ব সব দূরত্ব দূর করে ফেলে দিতে, আবার কখনো চাইত একদম একলা চুপ চাপ অশোক বনের সীতার মত বসে থাকতে আর এই দোটানার মাঝখানে যে মানুষটা সমস্ত দিনের কাজকর্ম্মের মধ্যে ঘুরে বেড়াত সে যে কি ছিল, তা আমি বলতে পারব না, তার না ছিল হাসি, না ছিল কান্না, না ছিল মান না ছিল অপমান, না ছিল রাগ না ছিল অনুরাগ!

২

যাক্, এমনি করে কতদিন কেটে গেল! তারপর হঠাৎ এমন ছুটী লোক আমাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হল, তারা যেন একেবারে আলো আর অন্ধকারের মত আলাদা। একজনের নাম, হাসি, আর একজনের ঠিক নাম কি জানিনে কিন্তু বাবা বল্লেন তিনি একজন স্ন্যাসী। আমরাও তাঁকে স্ন্যাসী মহারাজ বলেই ডাকতাম। একজন এল ফাল্গুনের দিনের মত একরাশ আলো, আর হাসি আর রূপ, আর

সাজসজ্জার অতিশয্যত্ব নিয়ে,—অন্যজন এলেন বর্ষার অন্ধকার রাত্রের মত গাম্ভীর্য্য নিয়ে জটাজুট সমাযুক্ত হয়ে, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তের সর্ব্ব-রিক্ত মহাশয়ত্ব নিয়ে। আর আমি পড়ে গেলাম মহামুস্কিলে, কারণ এ দুজনার একজনকেও ঠেকিয়ে রাখবার জো ছিল না।

হাসি এসে আমার চাল চলন, অসন বসন দেখে হেসেই অস্থির। আর ন্যাসী মহারাজ আমার ঐ সমস্তই লক্ষ্য করে বল্লেন, যে, আমা হতে কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা হবেন। হাসি আমার পূজা অর্চ্চনা পড়া শুনার ধুম দেখে রেগে সমস্ত বৈ কাগজ পত্র পুড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা দিলে। আর ন্যাসী মহারাজ তাঁর ঝুলি হতে একখানা পরমহংস সংহিতা বার করে আমায় উপহার দিলেন। একই বস্তু দুজনে দুরকম চোখে দেখছেন দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার সেই আঠার বছরের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, বিচারশক্তি, সমস্তই হঠাৎ কেমন থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল। অথচ দুজনের একজনকেও দূরে রাখতে পারলাম না। আমার চিরদিনকার শিক্ষা দীক্ষা যে সময় আমার ঐ ন্যাসী ঠাকুরের পায়ের কাছে বসিয়ে দিলে, ঠিক সেই সময়ই আমার অন্তরের অন্তরে যে মানুষটা ছিল সে যেন হাসির হাসির-হাওয়ার মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমার কাণ দুটো, শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনত, মনও তাতে যে যোগ দেয় নি তা নয়, কিন্তু মনের যা মন তা যে হাসির দূর হতে টানাটানি অনুভব করছিল সেটা ত' মিথ্যে নয়।

এই হাসিটী ছিল আমার মামাত বোন। আমার মামা ক্রিশ্চান হয়ে গিয়েছেন বলে আমার দিদিমা তাঁর মাতৃহীনা নাতনীটীকে নিয়ে মামার কাছ থেকে পালিয়ে এখানে এসেছেন।

তাঁর আশা বোধ হয় এই ছিল, যে আমাদের সংস্রবে এসে হাসি তার সমস্ত ক্রিশ্চানী শিক্ষাদীক্ষা, হাব ভাব, বিশেষতঃ তার অকারণ হাসির উচ্ছ্বাস টুকু ভুলে প্যাঁচা হয়ে বসবে। কিন্তু ফলে হল, 'উল্টা বুঝলি রাম'। সে এসেই বাড়ি শুদ্ধ মাতিয়ে তুললে। মা তার সংস্রবে পড়ে পূজা পাঠের অবসরে ঘর দুয়ার সাজান, ধোয়া মোছায় একটু বেশী মন দিলেন ; ঝিয়েদের কাজ কর্ম্ম বাড়া সত্ত্বেও তারা মন খুলে গল্প গুজব লাগালে, আশ্রিত আশ্রিতারা একটু ভাল খাবার দাবার পেতে লাগল এবং তাদের ছোট ছোটো ছেলে মেয়েরা পরিস্কার কাপড় চোপড় পরে বাড়ীময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। অথিতশালায়ও শুনলাম নাকি খরচ আর কাজ বেড়ে গেছে। ঝাড়ুদার বেহারা হতে আরম্ভ করে বাগানের মালী পর্য্যন্ত একটা শোভনতা রক্ষার মধুর অত্যাচারে সর্ব্বদাই ব্যস্ত হয়ে ফিরতে আরম্ভ করলে। এমন কি বাবাও যেন ক্রমশঃ তাঁর কঠোর শুচিত্বের আবেষ্টনী হতে শোভন নির্ম্মলত্বের আবহাওয়ায় পড়ে স্বস্তি অনুভব করলেন, অন্ততঃ আমার ত তাই মনে হল।

স্বামী মহারাজ কিন্তু নিজের অগাধ গাম্ভির্য্যের শিখরে অচল হয়ে বসে রইলেন। হাসি মাঝে মাঝে তাঁকেও নানা-প্রকারে আক্রমণ করতে লাগল কিন্তু তিনি এমনি একটা প্রশান্ত হাস্যে তার সকল রকম প্রশ্ন তর্ক যুক্তিকে ঠেলে দিতে লাগলেন, যে শেষে হাসি আর পারতপক্ষে তাঁর ত্রিসীমা মাড়াত না। ডাকলে বলত, "ওরকম হাজার বছরের আগেকার মানুষের কাছে গেলে অকারণে বুড়িয়ে যেতে হবে।"

আমি কিন্তু এই শান্ত গম্ভীর মানুষটীকে কিছুতেই বেশীক্ষণ ছেড়ে থাকতে পারতাম না, যখন তখন গিয়ে কাছে বসতাম, এটা

ওটা এগিয়ে দিতাম, যখন তখন যা তা প্রশ্ন করে তাঁকে ভাবিয়ে তুলতাম, না হয় এমন একটা উত্তর নিয়ে আসতাম যা সমস্ত দিন ধরে আমায় পেয়ে বসে থাকত। বাবা যখন তাঁর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতেন সেই সময়টা ছিল আমার সব চাইতে ভয়ঙ্কর সময়, কারণ সেই সময়টা আমায় উপস্থিত থাকতেই হ'ত—বাবার সেই রকম আদেশ ছিল। কিন্তু এই রকম বাধ্য হয়ে বসে থাকা, বাধ্য হয়ে ধর্ম্ম কথা শোনা আমার যেন তেমন সইত না;—তাই বাবা যখন থাকতেন না তখন যত ইচ্ছা এবং যেমন করে ইচ্ছা হ'ত তেমনি করে ন্যাসী মহারাজের ঝুলিটা নেড়ে চেড়ে দেখতাম। এবং তাঁর সেই সময়ের অবাধ সঙ্গোপনভোগ হতে যা পেতাম তাই যেন প্রকৃত লাভ বলে মনে হ'ত। মা দিদিমা বা অন্যান্য কোন সাধুসঙ্গলোলুপ আত্মীয়ের উপস্থিতিও যেমন এই অপূর্ব্ব মানুষটার উপর একটা ভাব-গৈরিকের আচ্ছাদন ফেলত, তেমনি আমার সঙ্গেও অনেক সময় যেন তাঁর মনের উপরকার সেই প্রবীনত্বের গৈরিকটা টেনে ফেলে দিয়ে ভিতরকার চিরন্তন কিশোর মানুষকে টেনে বার করত।

এঁর বয়স যে কত হয়েছিল তা বলতে পারিনে। বাবা বলতেন সত্তর পঁচাত্তর হবে—কিন্তু কিছুদিনের পরিচয়ের পর আমার তা মনেই হত না। আমার মনে হত যেন তিনি আমারই বয়সী। তাঁর চিমটে, তাঁর ধুনি, তাঁর ছাই ভস্ম, তাঁর কটা গোঁফ, জটা কিছুই যেন তাঁকে বুড়ো করতে পারেনি। অন্তরের খোলা মাঠে অবাধে ছুটে ছুটে খেলে বেড়িয়ে তিনি যেন অন্তরে চিরকিশোরই রয়ে গিয়েছিলেন। না ছিল তাঁর খাওয়া দাওয়ার ঠিক, না ছিল শোয়া বসার সময়। বেড়াচ্ছেন ত বেড়াচ্ছেনই—বসে আছেন

ত বসেই আছেন ; গল্প করছেন ত গল্পই করে যাচ্ছেন ; আবার চুপ করে আছেন ত এমনি চুপ যেন জন্ম হতে চির-মৌন। তাঁর গল্পের সময়ও দেখিছি। চারদিকের আকাশ বাতাসও যেন গল্প কর্‌ত, গম্ভীর আওয়াজে মুখর হয়ে উঠত। আবার তিনি যখন মৌন হয়ে থাকতেন তখন যেন মনে হত জগতের মধ্যে আওয়াজ বলে কোনো পদার্থই নেই। আমাদের গীত শাস্ত্রে নাকি বলে যে দিনের প্রত্যেক অংশের এক একটা প্রধান সুর আছে, এমন কি ষড় ঋতুরও এক একটা নিজস্ব সুর আছে। সেই সুর নাকি আমাদের গীত-বিশারদদের কাণে ধরা পড়েছিল, তাই বিভিন্ন সময়ের জন্য এবং বিভিন্ন ঋতুর জন্য বিভিন্ন রাগ রাগিণীর সৃষ্টি হয়েছিল। আমি অত শত বুঝি না, কিন্তু আমাদের ন্যাসী মহারাজ যখন যা করতেন বা বলতেন তার সমস্তই যেন সময়ের সঙ্গে স্থানের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যেত।

৩

কিন্তু হাসিরও আমার গুণ ছিল যে কত, তা বলে শেষ করতে পারি না। সে সারাদিন নানা কাজে ঘুর্‌ছে, কিন্তু দিনের শেষে দেখতাম এক একখানা চমৎকার ছবি তার ঘরের জানালার পাশে তৈরী হয়ে উঠেছে। কখন যে সে এত কাজ করে, ঘর সাজিয়ে, ছেলে পিলেদের খাইয়ে মুছিয়ে, রাজ্যের লোকের তত্ত্ব তল্লাস করে, এমন কি নানা রকম খাদ্য তৈরী করেও এই কলাবিদ্যার সময় পেতো তাও ধরতে পারতাম না ; কিন্তু এটা বেশ বুঝতে পারতাম যে তার প্রাণের হাসিটুকু তুলির মুখে ছবির ভেতর অতি সহজেই ফুটে উঠ্‌ত আর তা সহজেই ধরা যেত।

সে যা আঁকত তাতে কেবল থাকত আলো আর আলো শুধু রং আর রং। গাছপালা, জীবজন্তু, নদীসমুদ্র, পাহাড়পর্ব্বত,—সব তাতেই একটা সজীব আলোর সমাবেশ। সবই যে প্রকৃতির হুবহু নকল তা নয়, হয়ত সবটাতেই রংএর একটু আতিশয্যই থাকত, তবু যেন ঐ সব সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি হতে তার মনের মানুষটাকে আমি ধরতে পারতাম।

একদিনকার কথা বেশ আমার মনে পড়ে। সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল,—সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে একেবারে অন্ধকার, সম্মুখের দিঘীর জলও কালো হয়ে এসেছে, আম কাঁঠালের গাছের মধ্যে অন্ধকার জমে এসেছে কিন্তু আমি তার ঘরে গিয়ে দেখি যে সে ছবি আঁকচে। যদিও সেটা বরষারই ছবি বটে কিন্তু তাতে সে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে নানারঙের আলো ফুটিয়ে তুলেছে, আর একটা হরিণশিশু মাথা উঁচু করে অস্তমান সূর্য্যকে দেখছে। গাছের সবুজ পাতাগুলোর ডগা লালে লাল—আকাশে নীলের সঙ্গে লালের মেশামিশি, আর একটা রামধনুর এক অংশ ছবির কোণায় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আমি বল্লাম "এ হতেই পারে না—রামধনু দেখা গেলে সূর্য্য দেখা যেতে পারে না।"

হাসি হেসে বল্লে, "তা নাই বা গেল, তবু আমি তাই আঁকব।"

এর ওপর তর্ক চলে না তাই তর্ক বন্ধ হল, কিন্তু আমার মনের মধ্যে তর্ক চলতেই লাগল। একবার মনে হল বলি, যে, যা অসম্ভব তা কিছুতেই সুন্দর নয়, আবার তখনি মনে হল, যে, যা সুন্দর তাকে যে সম্ভবের মধ্যে ধরা দিতেই হবে তার মানে কি? যে যে জিনিষ কেবল নিয়ম মেনে চলে তাকে সুন্দর করে তুলতে

হলেই ত তার মধ্যে নিয়ম-ছাড়াকে সৃষ্টি-ছাড়াকে এনে ঢোকাতে হবে, নৈলে সৌন্দর্য্য যে কিছুতেই ফুটবে না। যা প্রত্যাশিতের মধ্যে অপ্রত্যাশিত তাই ত সুন্দর। যা নিয়মের মধ্যে অনিয়মিত তাই ত মনোমোহন।

হাসি তার ছবি থেকে মুখ তুলে একবার আমার দিকে চাইলে, তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে তার তুলি দিয়ে আমার কপালে একটা টীপ পরিয়ে দিয়ে বল্লে, "এই দেখ এই ভুরু দুটোর মধ্যে যা ছিল না তাকে সৃষ্টি করে, প্রকৃতির নিয়মকে উল্টে দিয়ে তোমার কপালখানি কত সুন্দর করে দিলাম। চল দেখবে।"

আমায় একখানা আয়নার সুমুখে দাঁড় করিয়ে সে এক মনে কি যে দেখলে তা সেই জানে, কিন্তু তার আদরের অপ্রত্যাশিত চুম্বনটুকু আমার প্রাণের মধ্যে এমন অপ্রত্যাশিতকে এনে দিলে যাকে নিয়ে আমি ঐ আয়নাখানার সামনে অবাক হয়ে নিজের দিকেই চেয়ে রইলাম। আমার চেহারার মধ্যে কি যে দেখছিলাম ঠিক জানি না, কিন্তু কেবলি মনে হচ্ছিল এই ত আমি আমার কাছে ধরা দিয়েছি। আমার যে "আমিটাকে" এত তত্ত্ব দিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারছিনে, এই ত আমার সেই 'আমি' একটী আনন্দে-ভরা চুম্বনে সুন্দর হয়ে স্থূল হয়ে আলো বাতাস মাটীর সমষ্টি হয়ে আপনারই কাছে ধরা দিয়েছি। এই দেহ হয়েই ত আমি আপনাকে পেয়েছি। আমি ত' অ-ধর নই, আমি যে পূর্ণ ভাবে ধরা পড়ে গিয়েছি।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে সন্ধ্যার পর স্বামী মহারাজের

কাছে গেলাম। কিন্তু দেখলাম তিনি চুপ করে বসে আছেন, আর বাবা তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে বসে আছেন। ইতিপূর্ব্বে কি কথা যে হয়েছে তা জানিনে—কিন্তু দু'জনে চুপ করে বসে আছেন দেখে আমার যেন কেমন ভয় করতে লাগল। কোনো কথাই বলতে পারলাম না, ধীরে ধীরে এক পাশে বসে পড়লাম। স্বামী মহারাজ ফিরেও চাইলেন না, কোনো কথাও বল্লেন না; কিন্তু বাবা একবার আমার দিকে চেয়েই আবার তাঁর দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। তার পর হঠাৎ বল্লেন, "তা হলে কি করব ?"

স্বামী বল্লেন "তীর্থ ভ্রমণে বেরিয়ে যাও, তা হলেই তাঁকে পাবে—তিনি আপনি এসে দেখা দেবেন, কিন্তু এখানে বসে থাকলে হয়ত পাবে না।"

কার কথা হচ্ছিল, কাকে পেতে হবে, কিছুই বুঝতে না পেরে আমি অবাক হয়ে একবার এঁর পানে একবার ওঁর পানে তাকাতে লাগলাম। বাবাও কিছুক্ষণ বসে থেকে শেষে উঠে গেলেন।

আমি অবসর পেয়ে ভাবলাম একবার জিজ্ঞাসা করি, কার কথা হচ্ছিল; কিন্তু স্বামী মহারাজ তার অবসর দিলেন না। তিনিও হঠাৎ উঠে অন্ধকার বারান্দায় গিয়ে পায়চারী করতে লাগলেন। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে, শেষে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনতে পেলাম স্বামী মহারাজ মৃদুস্বরে গান করছেন। তাঁকে কোনো দিন গান করতে শুনিনি, তাই হঠাৎ তাঁর মধুর গম্ভীর স্বর শুনে আমি চমকে উঠে, ধীরে ধীরে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

বাইরে একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছিল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছিল—আমি সেই বিদ্যুতের আলোকে দেখলাম স্বামী রেলিংএর উপর হাত রেখে অন্ধকার আকাশের দিকে চেয়ে গান গাইছেন। কি যে গাইছিলেন তা মনে নেই এবং বোধ হয় হিন্দি গান বলে বুঝতেও পারিনি, কিন্তু গানটার বিষয় এইটুকু মনে আছে যে যেন সেটা প্রতীক্ষার গান, কিম্বা বিরহের গানই হবে। তাই আমার কেবলি মনে হচ্ছিল যে এই বড় একটা আপ্তকাম পূর্ণকাম মানুষের মনের মধ্যে আবার এরকম করুণ সুরের উচ্ছ্বাস উঠল কেন?

তাঁকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখে আমি ফিরবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় তিনি কাছে এসে বল্লেন, "মা জানকি! তোমার জানকী নাম বদলে দিলাম, আজ হতে তুমি গৌরী—গৌরী হতে তোমার আপত্তি আছে?" আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইলাম; দেখলাম, তাঁর মুখে হাসির লেশ মাত্র নাই, তার পরিবর্ত্তে একটা ঔৎসুক্যের ভাব ফুটে উঠেছে। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে তিনি বল্লেন, "তোমাকে কি করতে হবে জান? একজন ঘরছাড়াকে ঘরে আনতে হবে,—গৌরী যেমন শ্মশানবাসী শিবকে গৃহবাসী মহাদেব করেছিলেন, তোমাকেও তেমনি একজনকে—কে সে জানিনে—একজন মহাত্যাগীকে মহাযোগী করতে হবে; এই কাজের জন্যই তুমি জন্মেছ, এইটীই তোমার এ জগতে জন্মাবার কারণ—বুঝেছ?"

আমি চুপ করে মাটীর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। স্বামী মহারাজ পায়চারী আরম্ভ করলেন। দু'চারবার ঘুরে আবার কাছে এসে বল্লেন, "এইটাই তোমার অদৃষ্ট তুমি বোঝো আর

নাই বোঝো মা, তোমা হতে এই কার্য্যই সিদ্ধ হবে। তোমার বাবাকেও তাই বুঝিয়েছি ; আর তিনি আমার কথানুসারে কাজ কর্ব্বেন বলেছেন। তুমি গৌরী হতে পার্ব্বে না মা? একটী শিবকেও কি শব হতে না দিয়ে শঙ্কর করতে পারবে না ?”

আমি কাতরভাবে বল্লাম, “কি করতে হবে বুঝিয়ে বলুন। যিনি ত্যাগী তিনি কি যোগী নন? যোগী তবে কে ?”

“যিনি ত্যাগের দ্বারা ভোগ করেন, যিনি অনাসক্ত হয়ে আসক্ত হন, এবং যিনি আসক্ত হয়েও অনাসক্ত থাকেন তিনিই যোগী। যিনি বিয়োগী তিনি কি যোগী হতে পারেন? যিনি সর্ব্বকে সত্য বলে স্বীকার করে মিথ্যা বলে মায়া বলে উড়িয়ে না দিয়ে যোগ-যুক্তাত্মা হয়ে অবস্থিতি করেন তিনিই যোগী। অন্য সমস্ত যোগই এই যোগের প্রাথমিক অবস্থা। তোমায় এমনি একটী যোগীকে তৈরী করতে হবে—পারবে না মা ?”

আমি বল্লাম, “আমি আপনার কথা বুঝতে তেমন পারলাম না, তবে এইটুকু বুঝলাম যে কোনো একজন সন্ন্যাসীকে গৃহী করতে হবে, তাঁর মুক্তির পথ বন্ধ করে বন্ধনের পথ করে দিতে হবে। তাই যদি আমার অদৃষ্ট হয়, তাই করব।”

ন্যাসী এইবার খুব জোরে হেসে উঠলেন—এত জোরে হাসতে তাঁকে কথনো শুনিনি। তিনি হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকে তাঁর আসনের উপর বসে বল্লেন, “মা মুক্ত না হলে কি পূর্ণরূপে বন্ধনের আনন্দ জানতে পারে? যে বদ্ধ জীব সে তো মুক্ত হবার জন্যই ছট ফট করছে, যে মুক্ত সেই পূর্ণ বন্ধনকে স্বেচ্ছায় স্বীকার করতে পারবে। যাক এসব কথা আর এখন নয়, যখন সময় হবে আপনিই বুঝতে পারবে। যখন তোমার প্রকৃত গুরুকে

পাবে, যিনি সহজেই তোমার সমস্ত বন্ধনের মধ্যে প্রবেশ করে তোমাকেও মুক্ত করবেন নিজেও আনন্দ পাবেন, তখন আনন্দ পাবে, তখন আমার আজকের কথা বুঝতে পারবে। এখন যাও কাল ভোরেই স্নান করে আমার কাছে এস।”

আমি ধীরে ধীরে ভিতরে চলে গেলাম। পরদিন প্রভাতে তাঁর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি হোম করছেন শুনলাম রাত্রি হতে এই কার্য্য হচ্ছে। বাবা তাঁর কাছে বসে আছেন। কেন যে এই অনুষ্ঠান তা বুঝতে পারলাম না। কিন্তু ঘণ্টাখানেক পরে স্বামী নিজে আমায় ফোঁটা পরিয়ে দিলেন, শান্তিজল দিয়ে আশীর্ব্বাদী ফুল দিলেন। তারপর বাবার দিকে চেয়ে বল্লেন, “আমার কাজ শেষ হল, আজই আমি যাব। এর পর যা যা কর্ত্তব্য তুমিই করো। হয়তো আর দেখা হবে না কিন্তু আশা আছে, তোমার এই কন্যা হতে এমন একটা সত্য তুমি জানতে পারবে, যা তোমার কেন, অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু তুমি না জেনেও সেই সত্যের জন্য নিজেও তৈরী হয়েছ এই কন্যাকেও তৈরী করেছ। তোমার চিরদিনকার আশার রামচন্দ্র আসবেন, এবং এমন ভাবে আসবেন যাতে সেই চিরন্তন গোপন সত্য তোমাদের উপলব্ধি হবে। মা জানকি! তোমায় এই টীকা পরিয়ে দিলাম, তুমি আজ হতে কেবল তাঁরই—যিনি কেবল তোমারি জন্য আসছেন, যিনি কেবল তোমারি। তোমারি হয়েই তিনি সবারই এবং সবারই হয়েই তিনি সর্ব্বাতীত।”

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বাবা নত হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন আমিও করলাম।

৪

ন্যাসী চলে যাবা মাত্র, হাসি বল্লে "বাঁচলাম।" চাকর দাসীরা বল্লে "বাঁচা গেল।" বাড়ীর অনেকেই মুখে না বলুক ভাবে বোঝালে যে ভালই হল, কিন্তু আমিত কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, যে, তাঁর জন্য কার কি আটকাচ্ছিল। সবাইত' যেমন খাচ্ছিল দাচ্ছিল হাসছিল কাঁদছিল, তেমনি হাসছে কাঁদছে, উঠছে, বসছে। তবে কেন তাঁর যাওয়ার পর এতবড় একটা স্বস্তির নিশ্বাস সমস্ত বাড়ীখানা হতে উঠে সজোরে আকাশের গায়ে পড়ল ? কে জানে কেন ?

হয়ত এতবড় একটা বৃহৎ জীবনকে এই এতটুকু সংসারে আঁটছিল না, হয়ত এতখানি প্রখর জ্ঞানের আলো এই অজ্ঞানের সংসারে সহ্য হচ্ছিল না, হয়তো বা এত কাছে এমন মুক্ত প্রাণের খোলা হাওয়া এসে সংসারের গোপনতার পর্দ্দাটুকুকে বারম্বার উড়িয়ে দিয়ে ব্যস্ত করে দিচ্ছিল। কিন্তু আর যার যাই হোক, আমার পক্ষে ন্যাসী মহারাজের চলে যাওয়াটা যে কি কষ্টের হয়েছিল তা বলতে পারব না। তিনি আসাতে আমি যেন এই বদ্ধগৃহের মধ্যেই বাহিরের মুক্তির আস্বাদ পেয়েছিলাম, আমি যেন ঘরে বসেই হিমালয়ের পার্ব্বত্যবায়ু, সমুদ্রের উদার উন্মত্ততা, পূর্ণপ্রাণের সরল স্বাস্থ্য, সমস্তই উপভোগ করছিলাম। তাই হঠাৎ তাঁর চলে যাওয়ার পরই অনুভব করলাম, আমি বদ্ধজীব। এতদিন একথা ভেবে দেখবার সময় হয়নি, কিন্তু হঠাৎ দুদিনের জন্য এই মুক্তজীবটী এসে আমায় বুঝিয়ে দিয়ে গেলেন যে আমি

সহস্র পাশে এবং পোড়ামাটীর একটা কারাগারের মধ্যে একেবারে আকণ্ঠবদ্ধ প্রাণী।

তিনি স্বাধীন তাই স্বাধীনভাবে এসে স্বাধীনভাবে চলে গেলেন।

কিন্তু সেই বনের পাখী এসে এই খাঁচার পাখীকে দু'দিনের জন্য বাইরের বনফল খাইয়ে এমন বড় করিয়ে দিয়ে গেলেন যে, আমার স্পষ্ট অনুভব হল, এই ছোট খাঁচায় আর আমার আঁটছে না; আমি এই সোণার খাঁচা হতে অনেক বড় হয়ে পড়েছি। আঠার বছর বয়সেও আমায় যত বড় করতে পারে নি এই এক মাসে আমি তার চতুর্গুণ বড় হয়ে উঠেছি।

হাসি আমার মুখ দেখে বল্লে "উর্ম্মিলা দিদি, তোমার কি হল? পড়া শুনা, যোগ যাগ ছেড়ে দিয়ে কী রাতদিন ছাতে ছাতে ঘুরে বেড়াও?"

আমি বল্লাম, "ছাতে ছাতে বেড়িয়ে কি যোগযাগ পড়াশুনা হয় না?"

"হতে পারে কিনা তুমিই জান, কিন্তু আমিত' দেখি, তুমি কেবলি ঘুরছ। পিসীমা বুড়ো হয়েছেন তবু তাঁর খাটুনির অন্ত নেই, আর তুমি এমন জোয়ান মানুষ কেবল গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়াবে? এ কোনদেশী ধর্ম্ম?"

"সকলের কি একই ধর্ম্ম? কেউ বা গায়ে হাওয়া লাগাতেই জন্মেছে, কেউ বা ঝড় তুলতে জন্মেছে। যার যা কাজ সে তাই করছে, তাতে রাগ কর কেন?"

হাসি খুব রেগে উঠে বল্লে, "এ সব কথা কেবল চোখে ধূলো দেবার জন্য, কিন্তু এতে যে কেবল পরের চোখে ধূলো দেওয়া

হচ্ছে তা নয়, নিজের চোখেও ধুলো পড়ছে। তোমাদের এই সখের ধার্ম্মিকতার খোরাক যোগাবার জন্য সারা সংসার বোকার মত খেটে মরছে, আর তোমরাও এমনি অন্ধ যে নিজেদের এই ধার্ম্মিকতার বাবুগিরীটা স্বাভাবিক আর জন্মগত হক্ মনে করে নিজেদেরও মাটী করছ। দুবেলা খেটে খুটে নিজেদের পেটের ভাত জুটতে হত ত' দেখতাম তোমাদের যোগযাগ ধর্ম্মকর্ম্ম কোথায় থাকত ?"

হাসির হঠাৎ এই অদ্ভুৎ পরিবর্ত্তন দেখে আমার হাসি পেল। আমি হাসতে লাগলাম, কিন্তু সে রেগে গম্ গম্ করে চলে গেল। আমিও কিছুক্ষণ ছাতে ছাতে ঘুরে নীচে নেমে গেলাম। নীচে গিয়ে দেখি, মা বসে গিয়েছেন তাঁর দৈনিক কাশীখণ্ড পাঠ করতে, আর বাড়ীর যত বন্ধুবান্ধব আশ্রিত অভ্যাগত এমন কি দাসদাসী পর্য্যন্ত সকলেই পরম ভক্তিভরে শুনতে বসে গিয়েছে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মার পাঠ শুনলাম। তারপর মাকে বল্লাম, "মা, এঁদের বই থেকে কাশীর মাহাত্ম্য শুনিয়ে কি হবে? এই কুম্ভমেলার সময় এঁদের কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে শুনিয়ে আন না।"

আমার কথায় সকলেই প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে অনুমোদন করলেন। কিন্তু মা বল্লেন, "যার ইচ্ছা হলে এখনি সব হতে পারে তাঁকেই বল না গিয়ে, তাঁকে না বলে আমায় বলে ফল কি ?"

আমি তখনি বাবার কাছে গিয়ে সে কথা পাড়লাম। বাবাও যেন এই কথার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। আমি বলবামাত্র তিনি বল্লেন, "বেশ তাই হবে মা, আমারও ক'দিন হতে

তীর্থ তীর্থ মন করছে। বিশেষতঃ এবার প্রয়াগে কুম্ভমেলা—এক সঙ্গে দুই কাজই হবে।"

আমি বল্লাম, "দু'কাজ কি কি ?" বাবা একটু যেন ইতস্ততঃ করে বল্লেন—

"তীর্থ দর্শন, সাধু দর্শন দুই হবে।"

আমার মনে হল বাবা যেন কি একটা কথা গোপন করলেন। যাই হোক আমি আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করলাম না।

হাসি এই তীর্থ ভ্রমণের কথা শুনে খুব উৎসুক হয়ে উঠল, এবং তিন চার দিনের মধ্যেই সমস্ত গুছিয়ে ফেল্লে।

কিন্তু আমাদের তীর্থে-যাওয়া ত' বড় সহজ ব্যাপার নয়, এ যেন রাজা হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গযাত্রা। আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী, বরকন্দাজ পাইক, অনাহুত রবাহুত কতই না লোকজনে আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ীটী যাত্রার পূর্ব্বে ভরে উঠল। বাইরের প্রকাণ্ড উঠানে, গরুর গাড়ী পাল্কি ইত্যাদি যান বাহনে একটা ছোটখাটো বাজার হয়ে উঠল। কর্ম্মচারীদের ডাক হাঁক, ঘোড়া গরুর চিঁহি হাম্বা, ছেলে মেয়েদের ছুটোছুটী কান্নাকাটী, এবং সকলের ওপরে প্রজাসাধারণের ক্রমাগত আনাগোনা আবেদন নিবেদন শুনতে শুনতে কর্ত্তাকর্ত্রী হতে আরম্ভ করে বাড়ীর চাকর দাসী পর্য্যন্ত সবাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। বাবা শেষে বিরক্ত হয়ে বল্লেন, "এত লোকজন নিয়ে গিয়ে কাজ নেই।" কিন্তু মা তা শুনলেন না—বাড়ীর কুকুর বেড়ালের পর্য্যন্ত বিশ্বনাথ দর্শনের ব্যবস্থা করলেন। এবং এই অবকাশে গ্রামের কত দরিদ্র অদরিদ্র ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলেই চোব্যচোষ্যাদির সঙ্গে এত

রকমের আর্থিক পারমার্থিক সুবিধা করে নিলে যে শেষে একদিন দেওয়ানজী এসে বল্লেন 'নগদ টাকা যদি এমনি করে এখনি হতে ছড়িয়ে দেওয়া হয় তা হলে এতবড় বাহিনীর তীর্থের খরচের জন্য এষ্টেটের দেনা হয়ে যাবে।" কিন্তু সে কথায় বড় একটা কেউ কর্ণপাত করলে তাত' মনে হলনা। প্রত্যেক চাকর দাসী কর্ম্মচারীর তিন মাসের মত মাহিয়ানা খোরাকীর সঙ্গে কাপড়-চোপড়ের ব্যবস্থা হল। তার ওপর তীর্থে খরচের জন্যও কিছু কিছু তারা পেলে। কিন্তু পথে বেরিয়ে তারা যে এক পয়সাও খরচ করেছিল তাত' স্মরণ হয় না।

যাই হোক এই হরিশ্চন্দ্রের কটক নিয়ে আমরা গয়া কাশী প্রয়াগ বৃন্দাবন মথুরা করে যখন আবার কুম্ভস্নানের জন্য প্রয়াগে ফিরলাম, তখন অনেকেরই মন বাড়ী বাড়ী করে উঠেছে। হাসিত' আর কিছুতেই থাকতে চায় না—এবং তার সঙ্গে অনেকেই বাড়ী ফিরবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে দেখে বাবা বল্লেন, "তা হলে যারা না থাকতে চায় বাড়ী ফিরে যাক।"

কিন্তু মা বল্লেন, "সেকি কথা! কুম্ভস্নান না করে? তা' কেমন করে' হবে?" কিন্তু অনেকেরই প্রাণের কুম্ভ পুণ্যে ভরে উঠেছিল, তাই তারা ত্রিবেণীর মহাযোগের স্নানের লোভ ত্যাগ করে, হাসির সঙ্গে যোগ দিলে। এবং দু'একদিনের মধ্যেই প্রায় অধিকাংশ লোক গৃহের দিকে ছুটে বেরিয়ে পড়ল। যে দুচারজন থাকলেন তাঁরা নিতান্তই মায়ের অনুগত; বিশেষতঃ তাঁরা প্রাচীনা তাই এই ভীষণ জন-সংঘের নানাভয়ের মধ্যেও তাঁরা মরণের ভয়ে ভীত হলেন না।

৫

দুলছে ফুলছে গর্জ্জন করছে, দিক হতে দিগন্তে মিলিয়ে গিয়েছে তবু একি ঠিক সমুদ্র ?

পুরীতে সমুদ্র দেখিছি, কিন্তু সে ত' এমন নয়! এযে কি দেখছি তা বলতে পারি না। পাগড়ী অপাগড়ী, সচুল অচুল, সটীক, অটীক নানাজাতীয় মাথার অন্ত নেই—মাথার পর মাথায় সমস্ত দিগদিগন্ত ছেয়ে গিয়েছে। ঠিক যেন সমুদ্র অথচ এই জনসমুদ্রের গর্জ্জনের সঙ্গে জলসমুদ্রের কলরোলের তুলনাই হয় না। কারণ জলসমুদ্রের গর্জ্জনে কেমন একটা একটানা সুর আছে, তাল আছে —কিন্তু এই জনসমুদ্র হতে যে আওয়াজ উঠছিল তাতে না ছিল সুর, না ছিল লয়। ছিল কেবল একটা বিরাট গুম্‌গুমানি—দূর হ'তে মনে হচ্ছিল যেন কোথায় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হচ্চে।

সমুদ্রের মত এই জনসংঘের মধ্যে ঢেউ ছিল, কিন্তু সমুদ্রের ঢেউ দেখলেই যেমন প্রাণে একটা বৃহৎ আনন্দের উদয় হয়, যেমন সহজেই সেই দিগন্ত-ব্যাপ্ত তরল প্রকৃতির আনন্দের সঙ্গে প্রাণের আনন্দরাশি মিশে গিয়ে একতালে নেচে ওঠে, এতে ত কৈ তা হচ্ছিল না। এই জনসমুদ্রের তরঙ্গ যখনই জেগে উঠছিল তখনি একটা "সামাল সামাল" ডাকের সঙ্গে আত্মরক্ষার পরম ভয় জেগে উঠ্‌ছিল। জল-সমুদ্রের ঢেউএর মত এ ঢেউও অন্ধ এবং অকারণ; তবু সেই অন্ধ প্রকৃতির চঞ্চলতার সঙ্গে এই সচেতন চক্ষুষ্মান প্রকৃতির চঞ্চলতার এত অমিল কেন তা কিছুতেই ধরতে পারি নি। সমুদ্রের জলকণাদের মধ্যে যে পরম একত্ব যে অনাবিল পূর্ণ সংযোগ ছিল, এই জনসমুদ্রের জলকণার মধ্যে তার

অভাব ছিল বলেই কি দুই সমুদ্রের মধ্যে এত অমিল? কে জানে কেন?

কিন্তু এই পুণ্য-লোভাতুর জন সংঘের কষ্ট দেখে কি মনে কেবল ভয় আর দুঃখেরই উদয় হয়েছিল? তাও ত নয়; বেশ মনে আছে যে আমার মনে ভয়ের সঙ্গে বিস্ময়, দুঃখের সঙ্গে ভক্তিরই উদয় হয়েছিল। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম যে এই ত্যাগী ও ভোগী, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, সাধু ও অসাধু, সংসারী ও অসংসারী, ধনী ও নির্ধনের মিলনভূমিতে এই মহামেলায় ভারতের সেই চিরন্তন আত্মাটাই আবির্ভূত হয়েছেন। সে আত্মা আছেন বলেই ভারত আজও ভারত। এ যে একটা মেলা—এ যে মিলন স্থান! সমস্ত বিপদ, সমস্ত কষ্টকে তুচ্ছ করে আমরা এই উন্মুক্ত আকাশের তলে এই গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলন ক্ষেত্রে মিলিত হয়েছি। কর্ম্ম প্রেম ও জ্ঞানের ত্রিধারা এই প্রয়াগে ত্রিনদীরূপে মিলেছে। তাই ভারতের ধর্ম্ম সাধনার সমস্ত সাধু, শান্ত ও মহান্ত, গৃহী, কর্ম্মী ও ধর্ম্মী সকলেই এই পুণ্যক্ষেত্রে এই পুণ্য মুহূর্ত্তে মিলেছেন। এখানে অন্য কিছু লাভ নেই কেবল মিলনই লাভ, এবং এই পুণ্য মিলন হতে ভারতীয় সাধনার সমস্ত রস দিকে দিকে আবার ছড়িয়ে পড়বে। তাই এই মিলনের মধ্যে এই আনন্দের মধ্যে যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত সুখদুঃখ ছিল তার দিকে কারও দৃষ্টি ছিলনা—আমারও তেমন পড়েনি।

কিন্তু মানুষ নিজের কাছে নিজে এতই বড় যে এই বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে কেউ আপনাকে হারিয়ে ফেলতে দিচ্ছে না। যাতে এই সমুদ্রে একেবারে মিশে যেতে না হয় তার জন্য এমনি

তার প্রাণপণ চেষ্টা যে এই সমুদ্রে প্রবেশ করেই প্রথম হতে তার চেষ্টা জাগে ঠেলে ঠুলে কোনো রকমে আপনাকে বাঁচিয়ে তারপর পুণ্যের যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকু আদায় করি। সে মিলতে এসে অমিলকেই বাঁচিয়ে চলে, তাই বোধ হয় এত ঠেলাঠেলি মারামারি।

সে যে কি ঠেলাঠেলি তা বর্ণনা করতে পারব না। চারদিকে সিপাই সান্ত্রী নিয়ে নিজেদের প্রাণটুকু বাঁচিয়ে আমরা যতই এই সমুদ্র ঠেলে অগ্রসর হয়েছি ততই দেখেছি যে মানুষের মিলনের মধ্যেও কি বীভৎসতা আছে, কি নিষ্ঠুরতা আছে। আবার কি দয়া আছে কি ভালবাসা আছে! চক্ষের উপর দেখলাম কত মানুষ পা পিছলে পড়ে গেল, আর কত লোক তার ওপর দিয়ে তাকে পিশে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু তার দিকে ফিরেও তাকাবার জো নেই এমনি এই সমুদ্রের মধ্যে পড়ে মানুষ চৈতন্যকে হারিয়ে জড়শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। পুণ্যের লোভে এসে প্রাণরক্ষার দায়ে সে কি শক্তিহীন হয়ে স্রোতের মুখে আপনাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে!

আর দিকে আবার এই বীভৎস দৃশ্যের মধ্যে মাঝে মাঝে যাঁরা এই অন্ধ জনস্রোতকে নিয়ন্ত্রিত করে চালাবার চেষ্টা করছিলেন তাঁদের দেখে আর এক ভাবের উদয় হচ্ছিল। কি তাঁদের দয়া! তাঁরা এই ভালবাসার দায়েই কত না কঠিন হয়ে কত না নির্দ্দয় হয়ে মায়ের কোল হতে' ছেলে স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রীকে কেড়ে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ স্থানে রেখে দিচ্ছেন! কত তাড়না করতে হচ্ছে, কত তাড়না সহ্য করতে হচ্ছে, তবু তাঁদের শ্রান্তি নাই ক্লান্তি নাই!

কিন্তু সব চাইতে ভয়ঙ্কর অথচ মহান মনে হয়েছিল এই ভাবটা, যে, এত বিপদে প্রতিপদে নিস্পেষিত হয়ে যাবার এত ভয় তবু ত' এই পুণ্য লোভীরা থামছে না, ছুটে আসছেই আসছেই। "ঐ নাগারা বেরিয়েছে," "ঐ যে দশনামীদের দল আসছে" "ঐ যে সারদা মঠের পতাকা" এই রকম হাঁকাহাঁকিরও অন্ত নাই, অথচ 'সামাল সামালের' ও অন্ত নাই।

কিন্তু কি দেখছিল তারা? কাকে দেখতে, কোন রাজাধিরাজের অভ্যর্থনার জন্য মরণ তুচ্ছ করে এই বিরাট জন সংঘের মধ্যে নানাদিক হতে নানা জনস্রোত এসে মিলিত হচ্চে। কে এঁরা, যাঁদের চরণ ধূলায় লুটাবার জন্য লাহোর হতে তাঞ্জোর, সোমনাথ হতে চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভারতের সমস্ত অংশই এ মহা-মেলায় জনস্রোত প্রেরণ করেছে? কে এঁরা কৌপীনধারী রাজরাজেশ্বরের দল যাঁদের চরণ ধূলায় আজ অনেক মুকুটধারী মস্তক লুটাচ্চে! কে এঁরা দেহধারী দেবতার দল যাঁদের রিক্ততার কাছে সমস্ত ঐশ্বর্য্য সমস্ত বাহুল্য লজ্জায় এঁদের গৈরিকের মতই রক্তবর্ণ!

সমস্ত সাধুদর্শন ও আত্মরক্ষার চেষ্টা করে আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লাম তখন বাবা বল্লেন "এইবার ফেরা যাক", কিন্তু ফেরা যাক বল্লেই কি ফেরা যায়? এই বিপুল জনস্রোত ঠেলে যাবার সাধ্য সম্মিলিত হাজার জন সৈন্যেরও ছিল কিনা সন্দেহ। আমরা ফিরতেও পারলাম না—পুণ্য করতে এসে সমস্ত দেহ মন আত্মা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় এবং ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়বার মত হয়ে উঠল। বেশ বুঝতে পারা গেল সমস্ত লোকই অনেকক্ষণ হতে মেলার স্থান হতে মুক্তি পাবার চেষ্টা করছে অথচ এমনি

বন্ধন যে আপনার চাপে মানুষ আপনি একেবারে নিশ্চল। আবার সে যখন চঞ্চল হয়ে উঠছে তখন নিজের ইচ্ছায় নয়, এমন একটা বিরাট কিছুর ঠেলায় যা নিজেরাই তৈরী করেছে অথচ এখন স্বেচ্ছায় তার ভিতর হতে বাইরে আসবার জো নেই।

ঠিক এমনি সময় এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যার জন্য আমি একেবারে প্রস্তুত ছিলাম না অথচ সেই একটী ঘটনাকে অবলম্বন করে আমার সমস্ত অতীত সমস্ত বর্ত্তমান হয়ত সমস্ত ভবিষ্যৎও একটা অখণ্ডসূত্রে বাঁধা হয়ে গেল। যেন আমার অর্থহীন জীবনের সমস্ত প্রলাপকে একটা অপ্রত্যাশিত অর্থ দেবার জন্য তিনি সেই মূহূর্ত্তে দেখা দিলেন।

কে তিনি? তাত' এখনো জানি না, জানবার অবসর পেলাম কোথায়? তিনি এলেন, রইলেন, চলে গেলেন, বাস্— এইটুকু মাত্র বলতে পারি। আর ত' কিছু জানি না!

কিন্তু কে বলে দেবে, তিনি কে? তিনি কি? তিনি কেমন? তিনি কোথায়? ঐ ধীর-মন্থরে দোলায়মান জনসমুদ্র হতে যিনি উঠে এলেন তিনি কে? এই বিশাল প্রাণসাগরের কোন সুদূরে তিনি ঘুমিয়ে ছিলেন? কে তাঁর সেই অনন্ত শয্যায় দোলা দিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙ্গালে? তার বিষয়ে কিছুই জানি না— শুধু বিস্ময়ে চেয়ে আছি, আশা করে আছি—তিনি সাগর হতে উঠে এসেছিলেন আবার সাগরেই মিলিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আবার আসবেন, আবার দেখা পাব। পাব না? নিশ্চয় পাব, নৈলে কি আমার এই চির আশা এমনি ভাবে পথের দিকে চেয়ে চেয়েই মরে যাবে? না—না কখ্খন না।

তাঁকে প্রথম দেখলাম অদ্ভুত অবস্থায়। একটী পশ্চিম দেশী স্ত্রীলোককে তিনি দুই হাতে উঁচুতে তুলে যেখানে আমরা আছি ঠিক সেই সিপাই-শান্ত্রীর ব্যূহের মধ্যে এনে ফেল্লেন। মেয়েটীর অবস্থা অতি ভয়ানক—সে একেবারে উলঙ্গা, তার কোলে একটা মরা ছেলে, লোকের চাপে ছেলেটার পেটের নাড়ী বেরিয়ে গিয়েছে, জীব বেরিয়ে গিয়েছে। মেয়েটার চোখমুখের অবস্থা যে কি ভয়ঙ্কর তা কেউ অনুমানে আনতে পারবে না। আর যিনি নিয়ে এলেন তাঁর মুখের উপর এমন একটা ভাব ফুটে উঠেছিল যা মানুষের নয় হয়ত দেবতারও নয়—সে যে কি ভয়ঙ্কর ভাব তা যে এই এত বৎসর পরেও ভুলতে পারছিনে! তিনি এলেন যেন দেবতার ক্রোধের মত হয়ে। তিনি এমন মূর্ত্তিতে এসেছিলেন যা দেখে আমাদের ঐ অতগুলো চৌগোঁপ্পা-ওয়ালা ভোজপুরী পাহালবানগুলো পর্য্যন্ত ভয়ে এতটুকু হয়ে গেল।

তিনি মেয়েটীকে আমাদের ব্যূহের মধ্যে নামিয়ে দিয়ে বল্লেন, "একে নাও।" তাঁর সেই গম্ভীর স্বরে মনে হল যেন বাবা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠলেন। অন্যান্য আত্মীয়াদের সঙ্গে মা'ত, একেবারে ভয়ে পিছিয়ে এতটুকু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমিই কেবল সাহস করে সেই ভয়ঙ্করকে সম্ভাষণ করলাম। তাঁকে যে ভয় করিনি কেন, তা বল্‌তে পারব না, সেই ভয়ঙ্করকেই যে কেন এত সুন্দর দেখেছিলাম তাও বলতে পারিনে। কিন্তু ধন্য ভগবান যে আমায় সে সময় সাহসী করেছিলে, ধন্য আমার অন্তরের দেবতা যিনি আমায় সেই সময়ে সেই আমার রুদ্রকে শিব বলে আবাহন করে নেবার শক্তি দিয়েছিলেন। ধন্য আমি! ধন্য আমি!

মেয়েটীকে আমি চাদর দিয়ে ঢেকে নিলাম সে কিছু বল্লে না। তারপর তার কোল হতে তার ছেলের মৃতদেহটা সরিয়ে নিতে গেলাম, কি প্রাণপন বলে সে সেই মৃতদেহটা টিপে ধরে রইলে। কিছুতেই দিলে না। আমায় মা বারণ করতে এগিয়ে এসে বল্লেন, "এমন সময় মড়া ছুয়ো না উর্ম্মিলা!" অমনি সেই রুদ্র মূর্ত্তি মায়ের দিকে ফিরে বল্লেন "মড়া! কোথায় মড়া?" বাবা বল্লেন, "ছেলেটী মরে গেছে তাই—" অদ্ভুত মানুষটি আরও রক্তবর্ণ হয়ে বল্লেন, "তোমাদের দ্বিধা হয় সরে যাও—যার দ্বিধা নাই তাকে কেন বাধা দিচ্ছ?" তারপর আমার দিকে তাঁর অদ্ভুৎ বিশাল চক্ষু দুটো ফিরিয়ে বল্লেন, "তুমি যা করছ কর, কারু কথা শুনো না।"

আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতই আবার মেয়েটীর কোল হতে মৃতদেহটা একটু সজোরেই সরিয়ে নিতে গেলাম, কিন্তু সে হঠাৎ এমন ভীষণ একটা চীৎকার করে উঠল যা ঐ দিগন্তব্যাপী জন-সংঘের কোলাহল ভেদ করে কত দূরে কত উর্দ্ধে উঠেছিল যে তা বলতে পারিনে। আমি আবার পিছিয়ে গেলাম, তখন সেই অদ্ভুত মানুষটী এগিয়ে এসে সেই মেয়েটীর কাঁধে হাত দিয়ে এমন ভাবে তাঁর চক্ষু দুটো মেয়েটীর মুখের উপর রাখলেন যে মেয়েটীর হাত আস্তে আস্তে অবশ হয়ে এল এবং ক্ষণকাল পরেই তার সন্তানের মর্ত্ত্য-অবশেষটুকু আপনি মাটিতে খসে পড়ল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেও কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ল।

তিনি তখন আমার দিকে ফিরে সেই মৃতদেহের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করলেন। আমি সেই অশুচী মৃতদেহ তুলে নিলাম।

কিন্তু তারপর ফিরে চেয়ে দেখি মায়ের মুখ ভয়ে এতটুকু হয়ে গিয়েছে। সেই মানুষটীও বোধ হয় তা লক্ষ্য করেছিলেন; তাই হঠাৎ আমার কাছে এসে হাত পেতে বল্লেন "কাজ নাই, দাও, আমিই এর ব্যবস্থা করছি। তোমরা এইটুকু ক'র যে এই হতভাগিনীর ভার নিও। যতদিন না এ সুস্থ হয় ততদিন কাছে রেখো। তারপর যেখানে যেতে চায় পৌছে দিও।" তিনি আমার কোল হতে সেই মৃতদেহটা প্রায় একরকম ছিনিয়ে নিয়ে সন্ন্যাসীদের জন্য যে পথ পুলিস দিয়ে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছিল সেই পথে গঙ্গার দিকে চলে গেলেন। সেই রাজাধিরাজের গতিতেও কেউ বাধা দিতে পারলে না, তাঁর আদেশ লঙ্ঘন করবার কথাও কারু মনে উদয় হল না।

৩

হে অপরিচিত, হে রহস্যময়, এই যাকে তুমি দিয়ে গিয়েছ এও কি চিরদিন তোমারই মত চিরমৌন থেকে যাবে? তুমি সেই যে দু'দিনের জন্য দেখা দিয়ে কোথায় কোন গোপনতার মধ্যে আপনাকে লুকালে আজও সেই গোপনতার অবসান হল না। আর এই যাকে তোমার চিরস্মৃতিরূপে রেখে গেলে, এও যে চিরদিনের মত মূক বধির এবং হতবুদ্ধি হয়ে চিরসুদূর দেবতার পাষাণ প্রতিমার মত হয়ে রৈল! একে নিয়ে আর কত দিন কাটাব? কত আর পাষাণের এই মূক প্রতিকের সেবা করে এর অধিষ্ঠাতৃদেবতার পুনরাবির্ভাবের আশায়, থাকব? কতদিন—ওগো কত দিন? দিনের পর দিন গেছে মাসের পর মাস গেছে বৎসরের পর কত বৎসর চলে গেছে, তবু তুমি দূরে—অতি

দূরেই রয়ে গিয়েছো! আর যে কাটেনা দিন—আর যে পারি না প্রভু!

যাক—যাক, না পারলেও পারতে হবে কারণ তাই তাঁর ইচ্ছা যে!

কতদিন হয়ে গেছে তবু সে দিনকার একটা কথাও ত' ভুলতে পারিনি। কেন পারি নি? আমি আজন্ম সমস্ত জগৎ ভুলতে সমস্ত মায়ার বন্ধন কেটে মুক্ত পাখীর মত ব্রহ্মাকাশে ঘুরতেই ত' শিখেছিলাম। তবু যে মুহূর্ত্তে আমার পিঞ্জর দেখতে পেলাম অমনি আপনা আপনি সেই খাঁচায় ঢুকে পড়লাম কেন? আপনি শিকল পরলাম কেন? এখন দাঁড়ে বসে ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে বসে আছি, যদি খাঁচার দ্বার কেউ খুলে দেয়, যদি শিকল কেউ ছিঁড়ে দেয়! কিন্তু কৈ সেই আমার একটী মাত্র মানুষ যে এই শিকল আপন হাতে খুলে দেবে? কোথায়—

না—না—এসে কাজ নেই, খুলতে এসে কাজ নেই; যদি খুলতে এসে এই শিকলে তুমিও বাঁধা পড় তা যে আমার মর্ম্মান্তিক হবে। না—কাজ নেই—কিন্তু—আবার কিন্তু কেন? কোন কিন্তু নেই। আমার চিরমুক্তি—এই আশাই আমার আকাশ, এই আশাই আমার চির বিচরণ স্থান।

কিন্তু, কেন তুমি এই অদ্ভুৎ ভার আমায় দিয়ে গিয়েছ তা যে বুঝতে পারলাম না প্রভু! আমার এত খানি সচেতন প্রাণ-প্রান্তরের মাঝখানে এই মূক মূঢ় পাষাণের মন্দির বসিয়ে গেলে কেন? যেখানে একদিন তুমি পা রেখেছিলে সেখানে এই বাক্যহীন বোধহীন জড় পিণ্ডের প্রতিষ্ঠা করে গেলে কেন? এ যে আমার সমস্ত দিনের সযত্ন রচিত পূজা অর্চ্চনা সেবা তোমারই

প্রতিনিধি হয়ে নিচ্ছে! একে যে একমুহূর্ত্ত ছেড়ে থাকতে পারিনে, ধুইয়ে মুছিয়ে থাইয়ে শুইয়ে কিছুতেই যে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারি না। দিনে রাত্রে হাজারবার করে এরই চার পাশে ঘুরে মরতে হয় যে। কি শক্তি এই জড় মেয়েটীর মুখের মধ্যে দেহের মধ্যে সঞ্চারিত করে গিয়েছ! এর সারা দেহে যে তোমারই বিশাল চক্ষুর সেই প্রবল দৃষ্টি ফুটে রয়েছে। আমার সারাদিন যে কেবল তোমার চোখের সেই দৃষ্টিটা দেখতে পাই। সেই তোমার সেই দিনকার সেই চোখ, যা শত সহস্র লক্ষ লোকের চক্ষের সামনে এই মৃতবৎ মুখের উপর রেখেছিলে, যা মাত্র এক নিমেষের জন্য আমারও চোখের ভিতর দিয়ে ঢুকে আমার অন্তরের মধ্যে রেখেছিলে—সেই তোমার সে দিনকার প্রচণ্ড করুণার দৃষ্টিটী!

তুমি চলে গেলে, কিন্তু এমন করে বেঁধে রেখে গেলে কেন, সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসী ত' মুক্তি দেয়, এই অখণ্ড মণ্ডলাকার বিশ্বে যিনি ব্যাপ্ত তাঁরই পরম পদই ত' দেখিয়ে দেয়। সে তো বাঁধে না। তবে তুমি সেই সেদিন অমন করে বেঁধে, অমন করে বাঁধন স্বীকার করে তবু চলে গেলে কেন? কিন্তু হে আমার সুদূরের দেবতা, এই ভক্তের বাঁধন একদিন তোমায় ক্ষণকালের জন্যও বেঁধেছিল এ কথা ত' সত্য! এ কথা ত' আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না। সেই গর্ব্বেই যে আমার সারা অস্তিত্ব ভরে আছে, সে গর্ব্ব কি তুমি কেড়ে নিতে পারবে? না সে শক্তি তোমার নেই। তাই আশা হয় আবার দেখা পাব—এ আশা আমার সফল হবে, হবেই হবে।

আঃ—আবার সেই সফলতার কথা। তিনি যাবার দিন যে অমূল্য পুরস্কার আমায় দিয়ে গিয়েছেন, তাঁর প্রাণের শেষ কথায়

ভরা এই খাতাখানাই আমার শেষ এবং শ্রেষ্ঠ লাভ বলে কেন মনে করতে পারছিনে? এইখানাতেই ত' তিনি চিরদিনের জন্য ধরা দিয়ে গিয়েছেন। আমিও ত' তাই তাঁকে না পেয়ে এই খাতাখানাতেই তাঁরই পাশে দিনে দিনে আপনাকে নূতন করে ধরা দিচ্ছি। এই খাতা খানার মধ্যে তাঁরই পাশে আমার স্থান হয়েছে ত' তবে আবার কি চাই তোর? ওরে লোভী, ওরে বিশ্বগ্রাসেচ্ছু, এততেও তোর ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে না?

যাক তাঁর কথা লিখি, ওরে মন সেইদিনগুলো আবার স্মরণ কর্!—

আমরা সেই মেয়েটীকে নিয়ে প্রায় সন্ধ্যার সময় বাসায় পৌঁছুলাম। কিন্তু তাকে এনে যে কি বিপদে পড়লাম তা বলতে পারিনে। সে কথা কয় না—উত্তর দেয় না, মড়ার মত পড়েই রইল। কি কষ্টে যে তাকে একটু দুধ খাওয়ালাম তা বল্‌তে পারি না। ছোটছেলে তবু আপত্তি করে কাঁদে হাত পা ছোড়ে, এবং তার কান্নাকাটীর ফাঁকে ফাঁকে, দুরন্তপনার সাহায্য নিয়েই তাকে খাইয়ে দাইয়ে ধুইয়ে মুছিয়ে তোলা যায়। কিন্তু এই মেয়েটী একেবারে জড়বৎ হয়ে গিয়েছে। দুঃখের ভয়ঙ্কর ঝড়ে তার আত্মা উড়ে পালিয়েছে, কেবল দেহের কোন গভীর কোণে প্রাণের একটা ক্ষীণ অবশেষ রেখে গেছে। সেই টুকু প্রাণের জোরে তার নিশ্বাস পড়ছে মাত্র, কিন্তু সেই প্রাণের শক্তি পাঁচটা ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত আর এসে পৌঁচাচ্ছেনা। তাই সে কেবল ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েই আছে, কথাও নেই নড়ন চড়নও নেই।

এমনি করে সেই রাত্রিটা কেটে গেল। তারপর দিনও কাটে

কাটে এমন সময় বাবা আবার সেই পরম আশ্চর্য্য মানুষকে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন।

তিনি সমস্ত দিন ধরে সাধু দর্শন করে বেড়িয়েছেন। কি যে তাঁর মনে ছিল জানি নে কিন্তু আমি সমস্ত দিন ধরে মনে করিছি যে বাবা একটী লোকেরই খোঁজে বেড়াচ্ছেন। আমি নিজে বেরুতে পারিনি, কারণ এই যে একটা জীবন-মৃত বস্তুর গুরু ভার তিনি আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন, একে ছেড়ে এমন কি তাঁর খোঁজেও বেরুবো কি করে? সমস্ত দিন একটু একটু করে একে খাইয়েছি সরিয়েছি নড়িয়েছি এইসব কাজে যারা আমায় সাহায্য করেছে তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে, কারণ এই মরণাধিক মরণাচ্ছন্ন প্রাণীটীত' শিশুর মত লঘুভারও নয় অথচ মৃতের মত একেবারে জড় বস্তুও নয়। তাই এর কি যে প্রয়োজন কি যে অপ্রয়োজন তাত জানবার জো নেই। বিশেষতঃ সবাই এসেছে পুণ্য সঞ্চয় করতে, এরকম পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীর সেবা করতে ত' কেউ আসে নি। তাই এক দিন যেতে না যেতেই দাস দাসী আত্মীয় স্বজন সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। আমিই কেবল একে সেই মহাক্ষণের মহালাভ মনে করে আগলে বসে আছি।

কিন্তু তিনি আপনিই এলেন। এবং এমন সময় এলেন যখন আমি এর মুখে বিন্দু বিন্দু করে দুধ দিচ্ছি, এবং যখন আমার চক্ষু দুটী এর মরণাচ্ছন্ন চোখ দুটীর মধ্য দিয়ে অন্য দুটী বিশাল চ'খের অপূর্ব্ব দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিল। ঠিক সেই মূহূর্ত্তে!

বাবার সঙ্গে তিনি এসে দাঁড়ালেন। একসঙ্গে জীবনের

তুই গুরু! আমি আস্তে আস্তে উঠতে যাচ্ছিলাম কিন্তু তিনি বারণ করলেন। তারপর আস্তে আস্তে সেই মরণাহত চক্ষু দুটীর উপর ঝুঁকে পড়ে কি যে করুণায় চাইলেন তা বলতে পারিনে সেই সময় সেই কক্ষে এমন একটা স্তব্ধতা অটল হয়ে বসে ছিল যে আমার বক্ষের রক্তের তালও যেন আমার কাণে অসহ্য বোধ হচ্চিল।

তিনি ক্ষণকাল তার দিকে চেয়ে হঠাৎ সেই করুণ দৃষ্টি আমার চোখের উপর রাখলেন। আমার যেন মনে হল আমার চ'খের মধ্য দিয়ে অতি শীতল গঙ্গা যমুনার জল তৃষিত অন্তরে প্রবেশ করল, আমি ধন্য হলাম! আমার জন্মজন্মান্তরের সমস্ত সাধনার সাফল্য যেন এক নিমেষে আমার মধ্যে ধরা দিলে! আমি ধীরে ধীরে যেখানে ছিলাম সেইখানে বসেই তাঁকে প্রণাম করলাম। অমনি মধুর গম্ভীর শব্দ হলো "ওঁ নমো নারায়ণায়। ওঁ প্রিয়ানাম্ ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে।"

কি মধুর সেই আবাহন! এ আবাহন ত' কেউ করেনি! ইনি এসেই একবার চেয়েই একবার ডাকতেই আমি—এই অন্তর—বেরিয়েছিলাম! এক নিমিষে আমি সমস্ত জগৎ হতে এঁর অন্তরে প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়তমা হয়ে পড়লাম। আবার ধরা দিয়েই তখনি আমি নিজের কাছেও প্রিয় হতেও প্রিয়তমা হয়ে গেলাম। ইনি এক নিমিষে আমায় এ কোন স্বর্গে নিয়ে গেলেন? এ কোথায় কোন চিরপ্রার্থিত সিংহাসনে তিনি আমায় বসিয়ে দিলেন। যখন আমি তাঁর ঐ আবাহন শুনলাম আমার অন্তরের মানুষটীও তখন না জেনেও নিশ্চয়ই বোধ হয় বলে উঠেছিল--

ওঁ গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে ওঁ প্রিয়ানাম্ ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে ওঁ নিধিনাম্ ত্বা নিধিপতিং হবামহে।

হে আমার লোকের মধ্যে লোকপতি তোমায় আবাহন করি। এসহে প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়তম, তোমায় স্বীকার করি। ওগো নিধির মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠনিধি এস তোমায় অন্তরের অন্তরে গ্রহণ করি!

৭

তারপর ক'দিন যে কি রকমে কেটেছিল ভাল স্মরণ নেই। স্বপ্নে জাগরণে মাতালের মতই কেটেছিল বোধ হয়। তিনি যে কি সব কথা বলেছিলেন, কি যে তার উত্তর দিয়েছিলাম জানিনা, কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই ফাল্গুনের এক অপূর্ব্ব দিনে, বসন্তের এক অপূর্ব্ব প্রথম প্রকাশের মধ্যেই তিনি আমার জীবনকে চির কালের জন্য তাঁর দক্ষিণপাণির মধ্যে গ্রহণ করলেন। আমার বাবা ত যেন চিরপ্রার্থিত বস্তু পেয়ে ধন্য হয়ে গেলেন। কি আনন্দ তিনি এই সন্ন্যাসীর হাতের মধ্যে দান করলেন তা তিনি জানেন। কিন্তু মা এবং তাঁর আত্মীয়েরা সকলেই ভয়ে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলেন কারণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে বিবাহ ত' কোন শাস্ত্রেই নেই! লোকে শুনে কি বলবে? সমাজে আমার এই বিবাহ স্বীকার করবে কি? একি হল!

কিন্তু বাবার মনে কোনো দ্বিধা ছিলনা—তিনি যেন হারানিধি খুঁজে পেয়েছেন, তিনি যেন চিরসাধনার সাফল্য পেয়েছেন, এমনি ভাবে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করলেন। সন্ন্যাসী শাস্ত্রীয় সমস্ত নিয়মই পালন করে আমায় গ্রহণ করলেন। সমস্ত রাত্রি

ধরে বাবা তাঁকে আর আমাকে একত্র বসিয়ে যজ্ঞ করলেন, তারপর ভোরের সময় আমাদের দুজনকে যেন কি একটা মহান ভাবের অগ্নির মধ্যে স্বাহা মন্ত্রে উৎসর্গ করে দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন।

আমি একবার মাত্র সন্ন্যাসীর দিকে চাইলাম, দেখলাম তিনি একদৃষ্টে যজ্ঞাগ্নির দিকে চেয়ে বসে আছেন। সেই আলোকে তাঁর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলে বেষ্টিত অপূর্ব্ব মুখখানা যেন সন্ধ্যা-সূর্য্যের মত ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর দেখাচ্ছিল। চক্ষে ছিল তাঁর এমন একটা জ্যোতি যা কোমল নয় অথচ কঠিনও নয়—যেন দুয়েরই সংমিশ্রন। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না, কেবল অন্তরে অন্তরে শিউরে উঠতে লাগলাম।

তারপর বাবা যখন শেষ আহুতি দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, তখন সন্ন্যাসীও উঠে দাঁড়িয়ে সংস্কৃতে বল্লেন, "আমি ধন্য হলাম আমায় আশীর্ব্বাদ করুন।" বাবা তাঁকে আশীর্ব্বাদ করতে এগিয়ে গেলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ালেন। আমি তখন তাঁর পায়ে প্রণাম করতেই তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বল্লেন, "আপনাকে আশীর্ব্বাদ করতে পারবনা। আপনি যে আমার দান গ্রহণ করেছেন এই আমার বহুভাগ্য।"

সন্ন্যাসী একবার আমার দিকে চাইলেন তারপর বল্লেন, "কি যে করলাম জানি না, হয়ত এই বালিকার মহৎ অপকার করলাম। আমি সন্ন্যাসী হয়েও একি করলাম! মানুষ মানুষ করে পাগল হয়ে বেড়িয়েছি, কিন্তু এমন মানুষ যে পাব তা কে জানত! আপনি যে আমায় এমন মানুষ দেবেন তা যদি জানতাম, তাহ'লে কি এমনি করে এই প্রকাণ্ড মেলার

অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ি? মানুষের বিরহে যত দিন ছুটে বেড়াচ্ছিলাম ততদিন বুঝিনি যে যতদিন প্রিয়ের মধ্যে প্রিয়কে না পাওয়া যাবে ততদিন ছুটোছুটী থামবে না। এই বালিকার মধ্যে তাঁকেই খুঁজব বলে এর কাছে এসেছি। কিন্তু তবু কেন ভয় করছে?"

বাবা চুপ করে ছিলেন না, সন্ন্যাসীর শেষ কথা শুনে বল্লেন, "ভয়! আপনারও ভয় করছে?" সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন না। পূর্ব্বাকাশে যে উষার আভাষ দেখা যাচ্ছিল সেই দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ ফিরে বল্লেন "হাঁ ভয়ই করছে, এই এতদিনকার সমস্ত সাধনার সংস্কার কি এক মুহূর্ত্তেই শেষ হয়ে যাবে? বোধ হয় যাবে না—বোধ হয় আবার যুদ্ধ করতে হবে। চিরদিন কামিনী কাঞ্চনকে ঘৃণা করতেই সাধনা করে এসেছি। হঠাৎ যে আমূল পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করেছি, একি মন সহজে স্বীকার করতে চাইবে? যতদিন মুক্তি সাধনা করিছি, ততদিন বন্ধন আমায় ভয়ঙ্কর জোরেই টেনেছে, আজ আবার সেই বন্ধন সাধনা করতে যাচ্ছি অমনি মুক্তি আমায় টানতে সুরু করেছে। তাই ভাবছি, কি জানি কি হয়।"

বাবা মুখ ফিরিয়ে উষার আলোর দিকে চাইলেন। ঘরের মধ্যে যে ঘৃতের বড় প্রদীপটা জ্বলছিল তার আলো ক্রমশঃ কমে আসছিল। আমি চুপ করে কাঠের মত সেই বিবাহের আসনেই বসে একবার বাবার দিকে একবার সন্ন্যাসীর দিকে চাচ্ছিলাম। কিন্তু ক্রমশঃ যখন প্রদীপ নিবে এল তখন ঐ অস্পষ্টতার মধ্যে অদ্ভুৎ মানুষ দুটী আমার কাছে যেন কোন এক অতীন্দ্রিয় লোকের

জীব বলে বোধ হতে লাগল তাঁদের কথাগুলি আমার কাণের মধ্য দিয়ে তন্দ্রাহীন প্রাণের এমন একটা স্থানে প্রবেশ করছিল যে আমি সে সব কথার একটিও ভুলতে পারিনি। কখনো যে পারবো তাও মনে হয় না।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লেন, "না কোন ভয় নেই—আমার মনে ঐ উষার আলোর মত আশা জেগে উঠছে। আমার বেশ মনে হচ্চে এর পরে এমন একটা সত্য সূর্য্যের মত জেগে উঠবে, যার আজকের এই আলো আঁধারের সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত ভয়, সমস্ত সন্দেহের অন্ধকার লজ্জায় মুখ লুকাবে। না আমার ভয় নেই—আমার চির প্রত্যাশিত সত্য তোমাদের দুজনার মধ্যে পূর্ণ প্রকাশিত দেখতে পাব। আর ভয় নেই—এস সন্ন্যাসী আজ তোমারও আমি গুরু হব—তোমাকেও আমি আশীর্ব্বাদ করব।"

বাবা এগিয়ে যেতেই সেই সিংহের মত কেশর যুক্ত মাথাটী হঠাৎ নুয়ে তাঁর পায়ের কাছে এল—বাবাও তাঁকে কি একটা বৈদিক মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করলেন।

তার পর মা এলেন, দিদিমা এলেন, আরও অনেকে এলেন, আশীর্ব্বাদও করলেন, কিন্তু সেই সিংহের মত মাথাটা আর সেই প্রথম দিনকার মত উঁচু হয়ে উঠল না। মন্ত্র-মুগ্ধ সেই পরম দুঃখে আমার চক্ষু জলে ভরে এল।

৮

কিন্তু যে সিংহ গিরিগহনচারী সে তাহার চিরবিচরণ স্থান ছেড়ে কতক্ষণ এই অকিঞ্চিৎকর পিঞ্জরে আবদ্ধ থাকবে?

তাই তিনি দু'দিন পরেই এই যে খাতাখানিতে আমাকে গেঁথে তুলছি এই মহামূল্য বস্তুটী আমাকে দান করে চলে গেলেন। আমি তাঁকে ধরে রাখতে চেষ্টাও করিনি। কারণ এ কথা ঠিক জানতাম যে ইনি নিজে বন্ধন না স্বীকার করলে, কেউ একে বেঁধে রাখতে পারবে না। তাই আমি একটী কথাও বলিনি, তিনিও কোনো কথা বলেন নি। শুধু যাবার সময় এই খাতাখানি আমার হাতে দিয়ে একবার আমার মুখখানা তুলে ধরেছিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে নিশ্বাস ফেলে সেই যে মুখ ফেরালেন, সে মুখ আর ফিরল না। আমি তাঁর কটা চুলের রাশ মাত্র শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেখেছিলাম! কিন্তু সেই লালে কালোয় মেশানো ধূমকেতুর পুচ্ছটী আমার মনের আকাশে চিরদিনের মত একি উজ্জল রেখায় আঁকা রয়ে গেল। একি মুছবে না?—এ ধূমকেতুর সামনের তারাটী কি চিরদিনের মত অস্তগতই থাকবে? তাকি কোন দিন উজ্জল হয়ে আর দেখা দেবে না—শুধু এই প্রাণের জগতে উপপ্লব জাগিয়েই রেখে দেবে?

বাবা কিন্তু বলেছিলেন "যাক আবার আসবে! আসতেই হবে! আমার আশা বিফল হবে না। জানকি, মা, ভয় নেই তোর।"

ভয় নেই বটে, কিন্তু অভয় ত নেই। সেই পরম অভয় যে দূরে কোথায় চলে গিয়েছে। তার পরিবর্ত্তে একটা দুর্ণিবার কঠিন সন্তোষ যে প্রাণের মধ্যে ধীরে ধীরে আসন নেবার চেষ্টা করছে। যেন মনে হচ্ছে আমি শুকিয়ে উঠ্‌ছি। কেন এই শুষ্কতা?দাবদাহ? কে আজ বলে দেবে—কেন? যিনি পারেন তিনি দূরে, যিনি

পারতেন তিনিও আজ তাঁর এই অধমা কন্যাকে, তাঁর চিরকালের শিষ্যাকে ছেড়ে চলে গিয়েছেন। এ বিশাল সংসারের মরুভূমে আমায় ফেলে বাবাও আজ কতদিন হল চলে গিয়েছেন। হায় আমার জনক ঋষি তাঁর জানকীকে ফেলে কোথায় গেলেন।

জানিনা তিনি সংসারের পারে গিয়ে তাঁর চির আশার চির সাধনার কোনো সফলতা দেখতে পাচ্ছেন কিনা কিন্তু আমি যে তা পাচ্ছি না এবং আর যেন পারছিও না। অথচ সেই পরম অপরিচিতকে পাবার আশাও ত' ছাড়তে পারছি না। যতই মনকে বুঝুচ্ছি, বাবার অন্তঃকালের শেষের কথাগুলি যতই মনকে বলছি যে, যা পাবার নয় তাকে না পাওয়াই পরম প্রাপ্তি, তবু অন্তরের অন্তরে যে আছে সে ত' কৈ বুঝছে না। তাই ত' আজও আমার চির-বাসর-শয্যায় চির-জাগরণে বসে থাকা। তাই ত' চিরদিন ধরে পথ চেয়ে সংসারের সিংহ দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। অথচ যিনি আমায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন তিনিও নেই যাঁর আশায় থাকা তিনিও আসছেন না। অথচ সেই আশাতেই ঐ অত বড় মন্দির তৈরী হয়েছে। সেই পরম সন্ন্যাসীকে মুহূর্ত্তের জন্যও যদি দেখতে পাই সেই আশাতে মা আমার জন্য ঐ অতবড় ধর্ম্মশালা তৈরী করেছেন। তাঁকেও বুঝ্‌তে হয়েছে যে এই আমার অদৃষ্ট! তাই অমন যে হাস্যময়ী হাসি সেও হাসি গোপন ক'রে, প্রতিদিন ঐ ধর্ম্মশালার তত্ত্বাবধান করছে। অনেক দিন আগে তার বিবাহ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু সেও প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে, যে তার উর্ম্মিলা দিদির স্বামী না ফিরলে সে বিয়ে করবে না। অন্ততঃ তার

বাবা যদি ফিরে এসে বিয়ে না দেন তাহ'লে সে তার দিদির মতই অপেক্ষা করবে। হয় তার বাবাকে চাই নয় তার দিদির স্বামীকে চাই।

তারপর কত সন্ন্যাসীই এলেন আর চলে গেলেন। বাবা বেঁচে থাকতেও অনেকে এসেছিলেন ; আমার মায়ের আমলেও কতদিন কত সাধুকে, সেই আমার একটী সন্ন্যাসীর আশার, আশ্রয় দিয়ে কত উপদেশ কত ধর্ম্ম-কথা শুনালাম। কিন্তু যে কথাটী শুনবার জন্য, যাঁর মুখের বাণী গ্রহণ করবার জন্য আমাদের বৃহৎ সংসার সমস্ত দ্বার উন্মুক্ত করে উন্মুখ হয়ে আছে, যাঁকে বরণ করবার জন্য আরতি করবার জন্য আমি আমার পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে বসে আছি, কোথায় তিনি?

তুমি কি ফিরবে না? কতদিন তোমার 'প্রিয় হতে প্রিয়তমাকে' ছেড়ে থাকবে? কতদিন ওগো—আর কতদিন!

আশাই কি আশার শেষ? বাবাত' তাই বলে গিয়েছেন—কিন্তু তাই যদি হয় তবে এই আশা-করার দুঃখের শেষ করে দাও। নিরাশার কঠিন সন্তোষকে ধরতে শেখাও। না হয় এই যাকে তোমার দেবত্বের কঠিন প্রতীক করে রেখে গেছ,—এই যে মৌন জড় বস্তুকে আমার বুকের কাছে দিয়ে গেছ, আমায় এরই মত করে দাও। এই বাক্যহীন সর্ব্বচেষ্টাহীন বালিকার অবস্থার ওপরেই যেন ক্রমশঃ আমারও লোভ হচ্চে। এর সঙ্গে থেকে যে ক্রমশঃ আমারও মূকত্ব পেতে ইচ্ছে হচ্চে, জড় হয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্চে। এ যেমন ভয়ঙ্কর দুঃখের আঘাতে একেবারে সুখ দুঃখের পরপারে চলে গেছে—আমারও তাতে লোভ হচ্ছে যে!

৯

যতদিন বাবা ছিলেন ততদিন একটা যেন জোর ছিল। কিন্তু তাঁর প্রবল অস্তিত্বের ছায়া যখন সরে গেল, তখন যেন আমাদের সকলের শক্তিই ক্রমশঃ কমে এল। তিনি যে এই অদ্ভুত সংসারের পক্ষে কি ছিলেন, তা সেই দিনই সকলে বুঝতে পারলে, যেদিন সমস্ত গ্রামখানির হাহাকারের সঙ্গে তাঁর মরদেহ শ্মশানে ছাই হয়ে গেল। তাঁকে যারা ভয় করত তারা সেদিন হ'তে ভক্তি করতে আরম্ভ করলে, যারা ভক্তি করত তারা ভালবাসতে লাগল, আর যারা হিংসা করত তারা সহস্রবার করে এসে মাকে জানিয়ে গেল যে, "তাঁর কোন ভয় নেই।"

সংসার তার পরে আবার ঠিকই চলছে,—সবই আবার মায়ের চতুর্দ্দিকে সহজেই স্বস্থান অধিকার করেছে। কিন্তু আমার জনক ঋষি, আমার জগৎগুরু চলে যাওয়াতে আমার যেস্থান শূন্য হয়েছিল তাত' কেউ পূর্ণ করতে পারেনি। সেই শূন্য স্থানটীর মধ্যে আমি কেন্দ্রহীন তারার মত ঘুরে মরছি! কবে যে এ ঘোরার শেষ হবে কে জানে!

বাবার মৃত্যুতে আমাদের সংসারে যে সব পরিবর্ত্তন ঘটেছিল, তার মধ্যে প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটেছিল হাসির। যে বোবা পাগল মানুষটী আমাদের মধ্যে আশ্রয় পেয়েছিল, তাকে ধরে হাসির সেই হাস্যময় মুখখানি যেন অতি সহজেই বর্ষার দিনের সজল উজ্জ্বল আকাশের মত থম থম করছিল। সেই বোবা মেয়েটী তার কোন পরিচয় দিতে পারে নি, তবু হাসি কি এক অদ্ভুত উপায়ে তার পরিচয় আবিস্কার করেছিল। মেয়েটী যখন

ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে আপনা হ'তে একটু আদটু নড়তে চড়তে আরম্ভ করলে, তখন হাসি, হঠাৎ একদিন বলে উঠলে, "মেয়েটীর নাম, ব্যথা"। মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করে জানলি"? হাসি সে কথার উত্তর না দিয়ে, চোখে জল ভরে কেবলি হাসতে লাগল। আমি বল্লাম, "ব্যথাই বটে,—শরীরের মধ্যে কাঁটা ফুটলে সেই কাঁটাটাই মূর্ত্তিমান ব্যথা হয়ে দাঁড়ায়। এও তেমনি হয়ে আমাদের মধ্যে আছে"।

মা বল্লেন, "ছি ছি তা কেন, অমন কথা ব'ল না তোমরা; তা হলে যে-দুজনার কাছ থেকে আমরা ওকে পেয়েছি তাঁদের অপমান করা হবে।"

হাসি বল্লে', "কখ্খন না—দাঁতে কাঁটা ফুটলে জিব যেমন সেইখানেই লেগে থাকে, ওই পরম দুঃখী মানুষটী আমায় তেমনি করে পিসেমশায়কে মনে করিয়ে দেয়। ওর নাম ব্যথাই বটে।"

মার চক্ষে জল দেখা দিল। তিনি তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে চলে গেলেন। হাসিও তার ঘরে ঢুকে ছবি আঁকতে বসে গেল। আমি হাসির পাশে দাঁড়িয়ে সেই ছবিটা দেখ্তে দেখ্তে বল্লাম—"এ ছবিখানা ব্যথার ছবি।" হাসি মুখ না তুলেই বল্লে, "ব্যথার নয় আশার—দেখছ না, মেয়েটীকে আকাশের মাঝখানে দাঁড় করিয়েও ওর হাত দুটো, চোখ দুটো ওপরের দিকে তুলে দিয়েছি? আকাশের ভয়ানক একাকীত্বের গৌরবের শিখরে উঠেও তার আশার শেষ হয়নি।"

আমি বল্লাম, "সেই জন্যই এ ছবি আশার নয় ব্যথার; যখন সে ভয়ানক একাকী তখনই সে ভয়ানক ব্যথিত।"

হাসি তার ছবি হ'তে মুখ তুলে আমার পানে চাইলে; তারপর

কিছুক্ষণ চেয়ে চেয়ে বল্লে, "ওঃ তাই এই ছবিখানার মুখে তোমার ছায়া পড়েছে। আমি না ইচ্ছে করেও তোমার মুখই এঁকে ফেলেছি।"

তার কথা যেন আমায় মারলে। আমি তাড়াতাড়ি আমার ঘরে পালিয়ে গেলাম। তারপর কতক্ষণ যে বিছানায় মুখ গুঁজে পড়েছিলাম জানি না। হঠাৎ হাসি এসে বল্লে, "একজন কে সন্ন্যাসী এসেছেন, ধর্ম্মশালায় বসে আছেন। তাঁর সারা শরীর হ'তে জ্যোতিঃ যেন ফুটে পড়ছে—চল না দিদি দেখবে।"

আমি চমকে উঠলাম—সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। তাড়াতাড়ি আবার বালিশে মুখ গুঁজে বল্লাম—"আজ নয় হাসি আজ নয়—কাল দেখতে যাব।"

পরের দিন স্নান করে, পুষ্পচন্দনে সাজি ভরে, পট্টবাসে দেহটাকে সাজিয়ে সাধু দর্শনে ধর্ম্মশালায় গেলাম। গিয়ে দেখলাম, কি দেখলাম! কি জানি কি দেখলাম। সেই উন্নত বরবপু, সেই আপৃষ্ঠ লম্বিত শুষ্ক চুলের রাশি, যেন কপিশ কেশর বেষ্টিত মুখ মহাসিংহ অজিনাসানে বসে আছেন। চক্ষে তাঁর অপলক দৃষ্টি, কিন্তু সে দৃষ্টি, কাউকে যে দেখছিল তা বলবার জো নেই।

কিন্তু একি সেই? এত বৎসর পরে কি সেই আমার পরম যোগী আমারই কাছে ঠিক তেমনি বেশে তেমনি রূপ নিয়ে ধরা দিতে এলেন? একি সেই? আমার মনের মধ্যে যে ছবিখানি এতদিন ধরে চুপ করে বসেছিল, আজকের এই প্রভাতের আলোকে সেই ছবিই কি এমনি ভাবে বাইরে এসেছে? হ্যাঁ, এ সেই বটে—

কিন্তু তবু কেন ভয় হ'ল? এ ভয় এতদিন কোথায় ছিল? এই যে এতদিন ধরে মনে করে এসেছি যে, যে মুহূর্ত্তে তিনি আসবেন সেই মুহূর্ত্তে তাঁর পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে বলব, "এই যে তোমায় পেলাম, এই যে তোমায় ধরা দিলাম।" কিন্তু কৈ, চিনতে পেরেও ত ধরা দিতে পারছিনে, ধরতেও ত' পারছিনে?

ইনি তিনিই—কিন্তু—

হাসি আমার মুখের দিকে চেয়ে নীরবে যেন জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "একি সেই?" আমি তার দিকে চেয়ে চক্ষু নত করলাম। সে কি বুঝলে জানি না, কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর নিকটে গিয়ে প্রণাম করে পূজোপহারগুলি রেখে দিলে। তিনি একবার তার দিকে চাইলেন, তার পর ফিরে সেই দৃষ্টিহীন দৃষ্টিতেই আমার মুখের পানেও চাইলেন। আমিও প্রণাম করে দূরে দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি মধুর গম্ভীর স্বরে বল্লেন, "তুমি কি উর্ম্মিলাদেবী?" আমি নত বদনে বল্লাম, "সেবিকার পিতৃদত্ত নাম জানকী, তবে মা আমায় আগে ঐ নামেই ডাকতেন।"

সন্ন্যাসী হাসির দিকে চেয়ে বল্লেন, "তোমার দিদিতে তোমাতে এত প্রভেদ! তুমি হাসি আর—বস'না তোমরা।"

দাসীর হাত হ'তে কম্বল নিয়ে আমরা দুজনেই বসলাম। তিনি অমনি সাজি হ'তে একটা পদ্মফুল তুলে নিয়ে ঘুরুতে ঘুরুতে বল্লেন, "তোমার পিতা স্বর্গে গিয়েছেন, কিন্তু যাবার পূর্ব্বে এখানেও স্বর্গ রচনা করে গিয়েছেন দেখছি। ইচ্ছে হচ্ছে দুদিন এখানে থেকে তোমাদের কষ্ট দিই, কি বল?"

কষ্ট! হায় সন্ন্যাসি, তুমি আজন্ম বৈরাগী, নইলে এমন নিষ্ঠুরের মত কথা কি বলতে পারতে?

হাসি তাঁর কথা শুনে হেসে বল্লে, "কত দিন কষ্ট দেবেন ?"

"কত দিন ? তা কেমন করে বলব ? যত দিন ইচ্ছাময়ী মায়াময়ী আমায় এখানে ভুলিয়ে রাখবে ততদিন।"

"কত দিন ভুলিয়ে রাখবে ?"

"তা কেমন করে বলব ?"

"কেন ? এর আর শক্তটা কি ? তু' মাস কি ছমাস"।

সন্ন্যাসী এতক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তার দিকে ফিরে চাইলেন। এইবার ভাল করে তাঁর চোখ দুটী দেখতে পেলাম—কি উজ্জ্বল গভীর চক্ষু দুটী! কিন্তু সেই চক্ষুটী দুর মধ্যে, যা খুঁজছিলাম তা যেন কিছুতেই পেলাম না। এ সেই—তবু যেন সে নয়!

হাসি হঠাৎ তাঁর দৃষ্টির আঘাতে যেন কেমন জড় সড় হয়ে গেল। লজ্জায় তার সুন্দর মুখখানি লাল হয়ে উঠল, এবং সেই লজ্জার মধ্যে কেমন একটা ভয়চকিত ভাব ফুটে উঠে তাকে চুরি-করতে-গিয়ে-ধরা-পড়া-চোরের মত দেখাতে লাগল।

তিনি তার দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন, "দুদিনও থাকতে পারি, দুবছরও থাকতে পারি—কিন্তু এসে পর্য্যন্ত যে রকম বেশী বেশী সেবা লাগিয়েছ, তাতে বেশী দিন টিকতে পারব না বোধ হয়।"

হাসি ব্যস্ত হয়ে আমার দিকে চাইলে, তারপর মৃদুস্বরে বল্লে, "আপনি যে রকম বলবেন ঠিক তেমনি সেবাই যদি হয় তা হ'লেই কি থাকতে পারবেন না ?"

সন্ন্যাসী এইবার উঠে দাঁড়ালেন, তার পর ধীরে ধীরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর সুন্দর সুঠাম প্রভাতালোক-স্নাত

মূর্ত্তির দিকে চেয়ে কত কি যে ভাবতে লাগলাম তার ঠিক নেই। কিন্তু হাসির প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে আমার মন যেন একটা অজানা আতঙ্কে শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। মনে হল, ইনি যদি তিনিই হন তাহলে কিছুতেই ধরা না দিয়ে, পরিচয় না দিয়ে যেতে পারবেন না। কিছুতেই নয়। আমার এত দিনকার সিদ্ধি এত কাছে এসে অসিদ্ধ হয়ে ফিরে যাবে না।

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ বাইরের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন। সেই যেখানে, দশ বৎসর আগে, ন্যাসী-মহারাজ প্রতি-প্রভাতে উঠে দাঁড়িয়ে থাকতেন, যেখানে দাঁড়িয়ে উষার প্রথম আলোটুকু দুই চক্ষু দিয়ে পান করে উষারই মত উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন, ইনিও সেইখানে প্রায় তেমনি ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। সম্মুখেই আমাদের বিস্তৃত পুষ্করিণীটী প্রভাতের আলোকে টল্ টল্ জ্বল্ জ্বল্ করছিল। ওপারের ঘাটে গ্রামের মেয়েরা কলসিতে জল ভোরে নিয়ে ধীরে ধীরে উঠছিল। পশ্চিম তীরের শিব মন্দিরের স্বর্ণ-কলস উজ্জ্বল হয়ে আকাশের দিকে ইঙ্গিত করছিল।

আমি সবই দেখলাম—এবং ঐ সমস্তের মধ্যেই ঐ প্রভাতের আলোকের জমাট দেহখানির দিকে ফিরে ফিরে চেয়ে দেখছিলাম।

হাসি আবার সেই প্রশ্ন করলে। তিনি চট্ করে ফিরে বল্লেন, "তোমরা যদি চাও তা হলে—" তিনি কি বলতে গিয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেলেন। বোধ হয় আমার মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল, হয়তো আমার বুকের রক্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল—হয়তো আমার সমস্ত দেহ থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। তিনি কি দেখেছিলেন জানি না, কিন্তু আবার মুখ ফিরিয়ে বল্লেন, "সন্ন্যাসীকে নিয়ে তোমরা কি করবে?

তাকে ত' কেউ সহজে চায় না—চাইলেও কেউ পায় না, কারণ সে যে নিজেরই নয়।"

হাসি এইবার জোরে হেসে বল্লে, "অর্থাৎ সে কারুরই নয়, কেবল একমাত্র নিজেরই। যাক, আমরা তাড়িয়ে না দিলে ত' যাবেন না ?"

সন্ন্যাসী ফিরিলেন না, কিন্তু তাঁর মধুর স্বর শুনতে পেলাম। তিনি বল্লেন, "সন্ন্যাসীকে কেউ চায় ? আশ্চর্য্য !" তিনি আস্তে আস্তে ধর্ম্মশালার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। আমি হাসিকে বল্লাম, "ছিঃ কি বেহায়ার মত কথা বলছিস্! উনি কি মনে করবেন !"

"কি আবার মনে করবেন ? আর, কিছু মনে করলেই বা ; উপায় কি ? যেমন করেই হোক ধরে ত' রাখতেই হবে ?"

"কেন ? যদি ইনি—"

আমার কথা শেষ হল না—কারণ যা বলতে যাচ্ছিলাম তা সাহস করে বলতে পারলাম না। হাসি হেসে বল্লে, "ইনিই তিনি। তোমার মুখ বল্‌ছে, চোখ বল্‌ছে, তবু তুমি সন্দেহ করবে ? আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"তুমি ত' কখনো দেখনি।"

"নাই বা দেখলাম, তবু একেই যে তুমি এতদিন ধরে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছ, তাতে কি আর ভুল আছে ? মা কাল দেখে গিয়েছেন—তিনিও চিনতে পেরেছেন। দিদিমাও চিনেছেন। এতগুলো লোক ভুল করবে ?"

"দশ বৎসর পরে দেখা, ভুল হতেও ত' পারে ?"

"তোমার হ'তে পারে কিন্তু আমার কোনো সন্দেহ নেই।"

আমি আর কোন কথা বল্লাম না, কিন্তু মন আমার এমন হয়ে গেল কেন ? সে যে পাওয়া-না-পাওয়ার মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলতে লাগল, দুলতে লাগল !—

এর উপায় কি ? কত দিন দুলতে হবে—এমনি করে না মরে না বেঁচে থাকতে হবে ? কে জানে কতদিন !

তৃতীয় অধ্যায়

প্রিয়ব্রতের কথা

১

হিতোপদেশের সেই মূষিক-সিংহের গল্পটা আজ মনে পড়ছে। ঋষি তাঁর পোষা ইঁদুরটিকে বেড়াল করলেন, বাঘ করলেন, সিংহ করলেন, কিন্তু তার তা সইল না। শেষে যে ইঁদুর সেই ইঁদুরই তাকে হ'তে হল। কেন? কেউ বলবেন নিয়তি, কেউ বলবেন বোকামী, কেউ বলবেন দুর্ভাগ্য, কেউ বলবেন দুষ্কর্ম্ম। কিন্তু আমি বলব, ওসবের কিছুই নয়, ইঁদুরের পরম সৌভাগ্য যে সে আবার ইঁদুর হতে পেয়েছিল। যা মিথ্যে, যা সে নয়, সে যে তা থাকতে পায়নি এ তার পক্ষে শাপ নয়, বর। মুনিবর তাকে পুন-মূর্ষিক করে পরম নিষ্ফলতা হ'তে বাঁচিয়েছিলেন। সত্যিকার সিংহের পক্ষে মূষিক হওয়াটা যেমন দুর্ঘটনা, সত্যিকার মূষিকের পক্ষে সিংহ হওয়াও তেমনি দুর্ঘটনা। যা সহজে হয়েছি, আমার যা সহজগতি তাকে বেঁকিয়ে চুরিয়ে যে দিকেই চালাও না—তা' সে স্বর্গের দিকেই হ'ক আর নরকের দিকেই হ'ক, সে গতিতে মঙ্গল নেই, স্বস্তি নেই, আনন্দ নেই।

এ কথা কেউ মানবে না, তা জানি। এই অসহজের গুরুভার ধার্ম্মিকের জগতে সে কথা মানাতে যাওয়াও যা, আর আমার মত বীরের পক্ষে, গন্ধমাদন তুলতে যাওয়াও তাই। বোঝাতে পারব না তা জানি, তবু বলতে হবে,—কারণ সেটাও আমার

স্বভাব। এতদিন ধরে বনে-বাদাড়ে, অনাহারে অনিদ্রায় যে সত্যকে জীবনের মধ্যে ধরতে পেরেছি, তাকে না প্রকাশ করা আমার পক্ষে সহজ নয়। আমি সহজের উপাসক, সহজের মন্ত্রদ্রষ্টা, সহজের ঋষি এবং সহজের কবি।

এই যে কথাটা রোদে পুড়ে, আগুনে ভাজা হয়ে, জলে গলে, শীতে জমাট হয়ে প্রাণের মধ্যে সত্য বলে ধরা দিয়েছে সেই কথা আমায় প্রকাশ করে বলতেই হবে, নইলে আমার অস্তিত্বের কোন অর্থ থাকবে না। কেউ নিরর্থক হ'তে চায় না, পারেও না— আমিও চাই না, পারবও না।

আমার বলবার কথা কি? আমি এই বলতে চাই যে, যে ফুল গাঁদাই হবে তাকে গাঁদা না হতে দিয়ে গোলাপ করে তুলতে চেষ্টা করলে, সে ফুল গোলাপ ত' হ'তে পারেই না কিন্তু ভাল গাঁদা হবার যে আশাটুকু ছিল তাও নষ্ট হয়ে যায়। মঙ্গলেচ্ছু মানুষকে তাই আপনার অন্তরে প্রবেশ করে দেখতে হবে যে কি কারণে এবং কি হবার জন্য সে জন্মেছে। আত্মানং বিদ্ধি, এইটাই হচ্চে চরম উপদেশ। আগে আপনাকে জান— যে তুমি কি হতে জন্মেছ, এবং কোন্ দিকে তোমার সহজ গতি। তারপর সেই গতিকে ঠিক করে জেনে, সেই গতি যাতে বাড়ে, যাতে সুন্দর এবং সুস্পষ্ট হয় তাই কর, তাহ'লেই তোমার পরমার্থ লাভ হবে, কারণ তখনি তুমি সার্থকতার দিকে চলতে পারবে। এই স্বরূপাভিমুখী গতিতেই আনন্দ,—এবং এই গতিকে বাধা দেওয়াই দুঃখ। অন্য যত দুঃখ আছে সেগুলা এর তুলনায় দুঃখই নয়। সেগুলা সুখের অপর পীঠ। সত্যি দুঃখ হচ্চে অজ্ঞান।

আত্মার এই অবাধগতিকে বাধা দেওয়াই মানুষের পরম অজ্ঞান। সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, লোভ, অহঙ্কার এই সমস্ত বড় বড় বাধা এই অবাধগতিকে ফেনিলোচ্ছল করে তুলছে। তাই মনে হচ্ছে যে মানুষ দুঃখ পাচ্ছে—নইলে অস্তিত্বই যে আনন্দের, তাতে সুখ-দুঃখ আসবে কোথা হ'তে? সুখও যেমন একটা তৈরী বস্তু, দুঃখও একটা তেমনি তৈরী জিনিষ। সে হয়ত পরমার্থতঃ কোথাও নেই, কোথাও সে কখনও ছিল না। কিন্তু হয়ত দিক্‌ভ্রমের মত কি এক অজ্ঞাত কারণে তাকে জগতের মধ্যে মানুষই জন্ম দিয়েছে। সে নৈলে তার চলে না, কারণ সুখ পেতে হলেই দুঃখ চাই।

বহু পূর্ব্বে একবার একজনের কাছে লিখে গিয়েছিলাম যে আমি দুঃখের লোভেই সংসার হতে বেরিয়ে পড়েছিলাম সুখের লোভে নয়। কিন্তু সংসারের বাইরে বেরিয়ে কেবল আনন্দকেই দেখতে পেয়েছি, দুঃখ কোথাও নেই। দুঃখ কেবল আছে মানুষের মনে। সে বাইরে কোথাও নেই এবং কেউ তাকে খুঁজে পায় না। যদি তাকে পেতে হত, ত' সৃষ্টি করতে হয়। কিন্তু সৃষ্টির বাইরে গিয়ে সৃষ্টি করা যায় না—তাই, যা সৃষ্টির জায়গা, যাকে মানুষ সংসার বলে বা জগৎ বলে, তারই মধ্যে না ঢুকলে দুঃখের সঙ্গে মুখোমুখী হওয়া যায় না বলে, সংসারেই ফিরতে হ'ল। এই দুঃখকে না চিনলে না পেলে সুখকেও পাবার জো নেই। এবং সুখ-দুঃখ না থাকলে এমন কি চৈতন্যই থাকে কিনা সন্দেহ—তাই আবার সেই দুঃখের লোভেই সংসারে ফিরে এলাম।

কিন্তু একথা লোককে বিশ্বাস করান কঠিন যে, যে-লোক

১৫-১৬ বৎসর গহন গিরিগুহার স্বচ্ছন্দ অটনের পরম সুখ অনুভব করেছে, সে কি লোভে আবার সংসারে ফিরে এল? সংসারে লোভের বস্তু কি আছে, অন্ততঃ আমার মত স্বাধীনতার সুখ যে অনুভব করেছে তার সংসারে ফিরে আসা নিশ্চয়ই বোকামী, নিশ্চয়ই অধঃপতন। অধঃপতন? তা হবে।—কিন্তু না এসেও যে আমি পারলাম না, আমার চুলের মুঠী ধরে যে নিয়ে এল। যাকে খুঁজতে গিয়েছিলাম, সেইআনন্দই যে বল্লে, "এই যা একলা হয়ে দেখলি তাই শেষ নয়, এর পরেও আছে।"

এর পর কি আছে? আপনাকে কুড়িয়ে গুটিয়ে-আনার আনন্দের পর আপনাকে ছড়ানর আনন্দ আছে—আপনাকে পরের মধ্যে অনুভব করার আনন্দ আছে। এবং তার পরে যা আছে সে হচ্ছে পরকে আপনার মধ্যে অনুভব। এই তিনটাই হচ্ছে এই মানুষের দেহ ধারণের ত্রিবিধ আনন্দ। এর পরে কি আছে জানিনে—কিন্তু মানুষের জীবনকে স্বীকার করে আত্মা এই ত্রিবিধ আনন্দ অনুভব না করলে, বুঝতে হবে, পূর্ণ আনন্দ এ জীবনে পেল না, অন্ততঃ আমি এইটুকু সত্য ধরতে পেরেছি। আমি ধরতে পেরেছি যে, আনন্দই আমাকে চুপ করে থাকতে দেবে না। আমাকে ঠেলে নিয়ে সে একবার গুহাহিত করবে, আবার যখন তার দরকার হবে তখনি আমায় সেই গুহা হ'তে বার করে হাটের মাঝে দাঁড় করিয়ে দেবে।

জানি যে, পরের মধ্যে আপনাকে, এবং আপানার মধ্যে পরকে অনুভবের সঙ্গে, জগতে যাকে দুঃখ বলে, ত্রিবিধ তাপ বলে, তাই আছে। কিন্তু আনন্দকে যখন পেতেই হবে, আনন্দই যখন আমার স্বরূপ, তখন সেই আনন্দের জন্য যা আসবে তাকেই

নিতে হবে। না নিয়ে যে উপায় নেই, কারণ এই সুখ আর দুঃখের, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মের, পাপ এবং পুণ্যের, জ্ঞান এবং অজ্ঞানের দোলায়, সব রকম দ্বন্দ্বের দোলাতেই আনন্দ দুলছেন এবং সেই দুলে দুলেই আপনাকে অনুভব করছেন। মানুষের দৈনিক জীবনেও এই সত্য চির পরিস্ফুট ;—সে দিনের বেলায় নানা কাজে নানা সুখ দুঃখের মধ্যে আপনাকে ছড়াচ্ছে, তার পর রাত্রি হলেই আপনাকে গুটিয়ে নিদ্রার মধ্যে গুহাহিত হচ্চে। এই দোলাই তার স্বরূপ, এই দোলাই সেই পরম দোলের ছায়া—যে দোলে পরমাত্মা একবার অহরাগমে বহু হয়ে বিকাশ লাভ করছেন, এবং রাত্র্যাগমে সমস্ত বহুত্ব নিজের মধ্যে লয় করে গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ হচ্চেন। আনন্দ-স্বরূপ আত্মার ইহাই দোললীলা। সুখ দুঃখ একা একা সত্য নয়—কেবল আনন্দের দুই পীঠ বলে দুই দিক বলে, তারই সত্যের মধ্যে সত্য।

আমিও ত' আত্মাই, আমি কি করে নিজের স্বরূপকে উল্টে দেব? আমায় সব রকম সুখ দুঃখের মধ্যে আপনাকে অনুভব করতেই হবে। কেউ যদি বলে যে জগতে সুখ একটা মিথ্যা সৃষ্টি, আমিও তা হলে বলবো যে, দুঃখও তা হ'লে একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা সৃষ্টি। যদি বল সুখ মানুষকে টানে, আমি বলব দুঃখেও তা হ'লে মানুষকে টানে, কারণ দুঃখ ছাড়া সুখ নেই, সুখ ছাড়া দুঃখ নেই।

হয়তো কেউ এ কথা মানবে না, কিন্তু আমার কথা যে সত্য তার প্রকাণ্ড প্রমাণ উদাহরণ আমি নিজে। নইলে সেই কত বৎসর আগে যখন নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিয়ে হিমালয়ের গুহার মধ্যে সমাধিস্থ করে এনেছিলাম, যখন মনে হয়েছিল যে

আর আমার কোনো বাসনা নেই, কোনো সুখ নেই, কোনো দুঃখ নেই, আমি কেবল আমারি আর কারুর নই, ঠিক সেই সময়ই মানুষ মানুষ করে ছুটে বেরিয়েছিলাম কেন? ঠিক সেই সময় মানুষের সান্নিধ্য উপভোগ করবার জন্য কুম্ভ মেলার হাটের মধ্যে—সেই ত্রিবেণীর মোহনায় উপস্থিত হয়েছিলাম কেন? আবার আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য্য, একটী নির্দ্দোষ নির্ব্বোধ মানুষকে বিবাহ করলামই বা কেন?

আমার ত' কিছুরই প্রয়োজন ছিল না, তবে কেন সেদিনকার সেই পরম অন্যায় করতে বাধ্য হয়েছিলাম? কে বাধ্য করলে? কে আমার চিরদিনের মুক্তিলোভী প্রাণকে বন্ধনলোভী করে দিয়েছিল? কে আমার প্রাণে ঐ অত বড় একটা ভয়ঙ্কর জনসংঘের মধ্যে আপনাকে অনুভব করতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলবার লোভ জন্মিয়ে দিলে? সে যদি আমার নিজেরই আনন্দ না হবে ত' কে? আপনাকে ভুলে পরকে অনুভব করার মধ্যে যে প্রচণ্ড আকর্ষণ আছে তা যে আমার নিজেরই আকর্ষণ, নইলে কেন সেই ভুল আমার হল? সেই ভুল করা, সেই মায়াকে স্বীকার করাও আত্মার সহজ ভাব, নইলে এ ভুল হ'ত না। ভুল? আচ্ছা, বেশ ভুলই, কিন্তু এ ভুল করতেই হবে, নইলে আনন্দই নেই।

আর এই ভুল করতে হবে বলেই দুঃখকে স্বীকার করতে হবে;—তাই মানুষ আমায় টেনেছে, মানুষের সংসার আমায় ডেকেছে, মানুষের দুঃখ নূতন মূর্ত্তিতে আবার আমায় আকর্ষণ করেছে। দুঃখকে অনুভব করতে আবার আমি ফিরলাম, কারণ, সে যদি বা আমায় ছাড়তে চায়, আমি যে তাকে ছাড়তে পারি না। ছাড়লে বুঝি আমার অস্তিত্বই থাকবে না।

তাই সব রকম দুঃখকে স্বীকার করে পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম সব রকম দ্বন্দ্বকে স্বীকার করে আমি আবার এলাম। কারণ, আনন্দ এই দ্বন্দ্বকে বাদ দিয়ে, অন্ততঃ আমার কাছে, নিজেকে জানাতে পারলেন না। আমি মানুষকে চাই, তা' সে যতই ছোট হোক, যতই অজ্ঞানে দুঃখে মোহে ডুবে থাক, তাকে চাই। নইলে আমার এই একাকীত্বের হাহাকার থামছে না। আমি এক তাই আমার মধ্যে অপরকে চাই, বহুকে চাই, সর্ব্বকে চাই। কে আমার এই পথের গুরু হবে? তাকেই খুঁজতে আবার বেরুলাম। এ পথের গুরু এ দিকে নেই, কারণ এ দিক একের দিক। যে পথে আমি বহু হয়ে বিশ্ব হয়ে ক্রমাগত বিকাশ পাচ্ছি, সেই পথে, সেই জগৎপথে, চঞ্চলের পথে, গতির পথে চলবার জন্য ফিরে এলাম। দেখি গুরু মেলে কি না, সঙ্গী মেলে কি না।

২

কেন ফিরেছি তা যতটা পারি বল্লাম, কিন্তু কি করে ফিরলাম তাও কি বলতে হবে? সে তো অতি সামান্য একটা কথা, কিন্তু সেটাও কি বলার দরকার? বেশ ভাই তাও বলছি। ঘটনা সামান্য বটে, কিন্তু আমার পক্ষে ত' সামান্য নয়, তাই সে কথা বলাই উচিত।

ঘটনাটা এই,—দশ বৎসর ধরে আপানার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি, অর্থাৎ যে কাজটা ঝোঁকের মাথায় করে ফেলেছিলাম তারই স্মৃতি আমায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছিল। কিন্তু এই ভয়ের হাত হতে কিছুতেই নিস্তার পাই নি; কৃচ্ছ্র

নয়, ব্রতে ধ্যানে নয়, সমাধিতেও নয়; কারণ এ যে আমার একেবারে অন্তরের অন্তরে স্থান নিয়েছিল, আমার অস্তিত্বের পীঠে পীঠ ঠেকিয়ে বসেছিল। এর হাত হতে ত্রাণ পাব কি করে? কিন্তু এই ভয়ের হাত হতে তখনি নিস্তার পেলাম যখন একে সত্য বলে স্বীকার করলাম। যখন সেই ভয়কে অভয়ের মধ্যে টেনে এনে ফেল্লাম তখনি বাঁচলাম। যখন বুঝলাম যে আমি কেবল আমার নই, যাকে পর বলে, তারও বটে, তখনি আমার এই ভয় হ'তে মুক্তিলাভ হল। তখন ওঁ পরতত্ত্বায় স্বাহা বলে বেরিয়ে পড়লাম। অন্তর হ'তে আবার বাইরের দিকে হারানো পথ খুঁজতে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘটনাটা অতি ছোট,—একদিন সমস্ত দিন না খেয়ে না চেয়ে সমাহিত হয়ে এক গাছতলায় বসে আছি, সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ নিয়ে তাল পাকিয়ে একটা জমাট বর্ত্তমান হয়ে বসে আছি। বহুদিনের অনাহার অনিদ্রা যখন আমার প্রাণকে প্রায় শুকিয়ে ধুনির আঙ্‌রার মত করছে, যখন সমস্ত দেহটা চিমটের মত কেবল ঝন্ ঝন্ ঠন্ ঠন্ করছিল, সমস্ত জগৎটা একটা সাহারার মত চক চকে একত্বে পরিণত হয়ে ধু ধু করছিল, ঠিক সেই সময়ে একটী ছোট্ট রোগা শিশু আমার অজ্ঞাতে ধুনির কাছে এসে বসেছিল। কতক্ষণ বসেছিল জানি না, কিন্তু যখন তাকে দেখতে পেলাম তখন অবজ্ঞায় তার দিকে চেয়েও চাইলাম না।—সে কিছুক্ষণ ভয়ে ভয়ে আমার দিকে চাইলে, শেষে হঠাৎ কাঁদ কাঁদ সুরে বল্‌লে, "মহারাজ, ময় ভুখাহুঁ।" মহারাজ! আমার ক্ষিদে পেয়েছে। আওয়াজটা যে আমার কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল তা জানি নে, কিন্তু হঠাৎ মনে হল যেন আমার মধ্যে ভূমিকম্প

হচ্ছে। এক নিমেষে সাহারায় সিরক্কো উঠল—বালি উড়ল, আঁধার হয়ে এল, সমস্ত অস্তিত্বটা হঠাৎ এমন ঝাঁকানি খেয়ে উল্টে পাল্টে গেল যে আমি উঠে দাঁড়ালাম। ক্ষিদে? আমার ক্ষিদে পেয়েছে? তাইত, এযে বিশ্বগ্রাসী ক্ষিদে। আমি যে অগস্ত্যের মত সারা সমুদ্রটাই একটানে পান করে ফেলতে পারি, আমার এমনি তেষ্টা পেয়েছে! গরুড়ের মত গ্রাম নগর গিলে ফেলতে পারি এমনি ক্ষিদে পেয়েছে যে আমার!

কিন্তু ওযে আমায় ডাকলে মহারাজ বলে!—মহারাজ! —আমি মহারাজ? আর একটা ছোট শিশুর ক্ষুন্নিবৃত্তির মত একটুকরো রুটীও আমার ঝুলিতে নেই? তবে আমি কিসের মহারাজ?

আমি চট্ করে উঠে ছেলেটাকে দুহাতে জাপটে তুলে ছুট্লাম। ছুটে ছুটে একদল সন্ন্যাসীর আশ্রমে পৌঁছে ছেলেটীকে নামিয়ে বল্লাম—

"ময় ভুখা হুঁ।" তারা আমায় খেতে দিলে, কিন্তু সে আহার্য্য আমি ছেলেটীকে দিয়ে আনন্দে নাচতে লাগলাম। সন্ন্যাসীরা কিন্তু হাসতে লাগল, বল্লে "মায়া—মায়া, তুম্ মায়ামে গির গিয়ে হো!" মায়ায় পড়িছি? হবে—কিন্তু ওরে—এ মায়ায় এত আনন্দ! এ ভ্রমে এত সুখ! শিশু খাচ্ছে আর তার প্রতি গ্রাসের সঙ্গে আমার অনুভব হচ্ছিল "আমি তৃপ্ত হলাম—আমি আনন্দ পেলাম—আমি বাঁচলাম।" এই কি ভ্রম? একেই আমার এত ভয়!

যাক, শিশু কতদিন বুভুক্ষিত ছিল তা জানিনে, কিন্তু সে এত খেয়ে ফেল্লে যে তার পর দিনই তার অসুখ করলে।

তার সেবা করতে করতে কত দিন কেটে গেল, কিন্তু সে যত কষ্ট যত দুঃখ ভোগ করতে লাগল ততই যেন আমার মনে হতে লাগল, যে ঐ শিশু দেহে আমিই সব দুঃখ ভোগ করছি। তার সমস্ত দুঃখের মধ্যে আমি আমাকে অনুভব করে ভয়ঙ্কর সুখের সঙ্গে মধুর ভীষণ দুঃখকে ভোগ করতে লাগলাম।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হল, আমি এই মরণোন্মুখ শিশুর মধ্যেই বেঁচে গেলাম, এর কষ্টের মধ্যেই আমি বেঁচে গেলাম, এর কাতর ক্রন্দনের মধ্যেই আমি বেঁচে গেলাম।

শিশু বাঁচলে না—কিন্তু তার প্রাণ দিয়ে আমায় বাঁচিয়ে গেল। আমিও ছুটে পালিয়ে এলাম—আমায় বাঁচতেই হবে, দুঃখকে প্রাণের মধ্যে স্থান দিয়ে আমায় বাঁচতেই হবে। ওগো ভ্রম! ওরে অজ্ঞান! ওরে আমার চিরন্তন ভুল! তোকে কোন এক অকাল বসন্তের দিনে আমার তৃতীয় চক্ষের আগুনে ভস্ম করেছিলাম মনে নেই। কিন্তু কে জানত যে সেই ভস্ম আমার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে গায়েই ছিল। তারপর কোন 'সকাল বসন্তোদয়ে' সেই ছাই হতে আবার তুই মরুরপাখা ফিনিক্সের মত জেগে উঠেছিস্। শিশুর নব-প্রাণ আমার শুষ্ক আত্মাকে রসে রসিয়ে, ফুলে ফুটিয়ে, অশ্রুতে ভিজিয়ে বাঁচিয়ে দিলে। আমি পালিয়ে এলাম। মরণাধিক মরণ-সাগর হ'তে জন্মমৃত্যুর কোমল দোলায়-মান রসসাগরের তীরে আবার এলাম। তোমরা ভাই গালই দাও আর 'জটা-মুকুট' মুড়িয়েই দাও—আমি তবু বলব, আমি তোমাদের ভাই, তোমাদেরই।

৩

'বৈরাগ যোগ কঠিন উধ অব না করব হো—সমস্ত সংসার গেয়ে উঠছে। আমি গাইব না?—আমিও প্রাণপণে গাইতে গাইতে, কাঁদতে কাঁদতে, হাসতে হাসতে পালিয়ে এলাম। কিন্তু কোথায়? সেই যেখান থেকে বেরিয়ে ছিলাম, সেই আমার আদি স্থানে—জন্ম স্থানে। সেই যেখান হতে কোন এক বসন্ত প্রভাতে বসন্তের গৈরিক বসন ধারণ করে, বেরিয়ে পড়ে, মনে করেছিলাম—জীবনে ফাগুন চৈত্রের শেষ হল, এইবার বৈশাখের প্রচণ্ড আলো ফুটে উঠবে, সেই আমার গ্রামে সেই আমার জীবনের আরম্ভ স্থানেই পৌছিলাম। যেখানে পরম মায়াবিনীর কাছে বিদ্রোহ করি সেইখানেই প্রায়শ্চিত্ত করতে ছুটে এলাম। আমি ত' জানতাম না যে, সেইদিনকার সেই বৈরাগ্যের বসনের লাল রংটার সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত আমার পাছু নিয়েছিল। পলাশ শিমুল কিংশুক আমার গায়ে লেগে গিয়েছিল, অশোক গোপনে গোপনে আমার প্রাণের তলাটা রাঙিয়ে রেখেছিল। পদ্ম আমার হৃদয়দহরে একেবারে শত পাপ্‌ড়িতে ফুটে চুপচাপ বসেছিল! তাদের দেখেও দেখিনি, অবজ্ঞা করে অবহেলা করে কেবলি পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছি; কিন্তু আজ তারা সময় পেয়ে একেবারে অন্তর হতে বেরিয়ে আমার সারা পথটা টিটকারী দিতে দিতে, দুয়ো দুয়ো করতে করতে এসেছে। আমি গ্রামে ঢুকলাম, সেই রকম এক বসন্ত প্রভাতে, তেমনি এক ঊষার মধুর আলোকে, তেমনি এক "পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা" পথ দিয়ে।

গ্রামে ঢুকলাম, কিন্তু হায় সবই চেনা তবু এমনি অচেনা হয়ে গেছে যে, সবাই সত্যানন্দ সন্ন্যাসীকেই প্রণাম করলে, আসন দিলে, তবু তাদের প্রিয়ব্রতকে ডেকে নিলে না। সন্ন্যাসী আদর পেলে পূজা পেলে, কিন্তু তাদের বাল্যের প্রিয়ব্রত বুভুক্ষিতই থেকে গেল। গ্রামে বন্ধুদের কাছ থেকে মায়ের কাছে গেলাম। গিয়ে কি দেখলাম? দেখলাম, মাও আমার অচেনা হয়ে গিয়েছেন, নতুন সংসার পেতে নতুন মানুষদের নিয়ে নতুন হয়ে বসে আছেন। যে তাঁর দেহ হতে দেহ, প্রাণ নিয়ে তাঁরই কোলে বড় হয়েছিল, সে আজ তাঁর কেউ নয়। আর যাঁরা কেউ নয় তাঁরাই আজ তাঁর সব। তিনি তাদের নিয়ে আবার নতুন করে জীবন আরম্ভ করেছেন। আমি পরিচয় দিলাম, কিন্তু সে পরিচয় তাঁর চোখ দেখে বুঝলাম বিশ্বাস হল না। মনে করলেন, কে বুঝি তাঁকে ঠকাতে এসেছে।

কিন্তু আমি ত' ঠকাতে আসিনি, তাই দু'দিন তাঁর কাছে রইলাম। তিনিও কি জানি কেন আমায় ধরে রাখলেন, কিন্তু তাতে যাঁরা আমার সেই পরিত্যক্ত বিষয় ভোগ করছিলেন, তাঁদের ভয় হল। তাঁরা শত্রুতা আরম্ভ করলেন। এবং সেই সঙ্গে সংসারের চিরন্তন সুখ আরম্ভ হল।

এতে কার দোষ দেব? কারু নয়, তাঁদেরও নয়, আমারও নয়। তবে কার? কার জানিনে, তবু এই সংসার। এবং একেই ভক্তির সঙ্গে স্বীকার করতেই হবে—কারণ এই এর স্বরূপের এক দিক। কিন্তু আর দিকও আছে। কি? তাও বলছি।

আমার আত্মীয়েরা যখন দেখলেন যে বেটা, ভক্ত-বিটেলে সন্ন্যাসী কিছুতেই যায় না, দুবেলা বসে ভাতের কাঁড়ী লুস্‌ছে এবং মাও

যেন একটু তার দিকে ঢলে পড়বার মত হয়েছেন, তখন গালিগালাজ হ'তে লাঠি সোটা পর্য্যন্ত বেরুল। মা তখন ব্যস্ত হয়ে আমায় পাখা দিয়ে আগলাতে লাগলেন।

কিন্তু আমিও নাছোড়বন্দা—স্থানুর ন্যায় অচল হয়ে বসে, বল্লাম, "আমি কিছু চাই নে, শুধু এই বারান্দাটায় পড়ে থাকতে চাই, তাও কি তোমরা দেবেনা?" কিন্তু আত্মীয় স্বজন থেকে আরম্ভ করে পাড়াপড়সীরা পর্য্যন্ত এমন রুদ্র মূর্ত্তি ধারণ করলে যে, মা শেষে ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "বাছা, তুমি যাও। তোমায় দেখে বড্ড মায়া হচ্চে, কিন্তু মায়া হচ্চে বলে ত' তোমায় মরতে দিতে পারব না, তুমি যাও।"

আমি বল্লাম, "আমি তোমার প্রিয়ব্রত!" মা কেঁদে বল্লেন, "আমার তা বিশ্বাস হচ্চে বাবা, কিন্তু এরা যে তা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।"

আমি কেঁদে বল্লাম, "আমি ত' কিছু চাইনে, শুধু তোমার পায়ের কাছে পড়ে থাকতে চাই।"

মা বল্লেন, "এরা যে তা বিশ্বাস করছে না বাবা।" আমি বল্লাম, "তুমি ত' বিশ্বাস করেছ মা—তোমায় এত দিনকার এত কথা বল্লাম, যে সব কথা কেউ জানতে পারে না, জানেও না, তাও বল্লাম, তবু কি তুমি আমায় ছেলে বলে মানবে না—বিশ্বাস করে কোলে স্থান দেবে না?" মা বল্লেন, "ওরা যে বলে তুমি সন্ন্যাসী মানুষ, মনের কথা জানতে পার। তুমি আমায় ভুলিয়ে এই বিষয় আশয় ভোগ করবার জন্য এই সব বলছ।"

হায় রে! আমার সন্ন্যাসীত্বই আমার চিরবিরোধী। যে স্থান আমার সহজই ছিল, সেই স্থানই আমার পক্ষে এত অসহজ

এত দুর্লভ হয়ে উঠেছে। ওগো লীলাময়ী, এ তোর কি লীলা গো।

যাক, আমি তবুও উঠলাম না, কেবল কাতর ভাবে জানিয়ে দিলাম, আমি প্রিয়ব্রত। কিন্তু কি জানি কেন কেউ সে কথা কিছুতেই মানলে না। শেষে একদিন তারা পরামর্শ করে আমার জটা মুড়িয়ে দিলে, গেরুয়া কেড়ে নিলে, চিমটে ভেঙ্গে দিয়ে একটা ছেঁড়া কাঁথা ঘাড়ে দিয়ে মায়ের সামনে দাঁড় করিয়ে বল্লে, "চেয়ে দেখুন দেখি এ কি আপনার সেই প্রিয়ব্রত!"

মা চেয়ে চেয়ে বল্লেন—"সে ত' এত ফর্শা ছিল না—তার মুখ ত' এত চকচকে ছিল না। তার কালো কালো কোঁকড়া চুল ছিল। কিন্তু কপালের ঐ দাগটা, ওটা যেন—"

মাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমার আত্মীয়গণ আমার গলা টিপে বাড়ীর বার করে দিলেন।

আমি বাইরে এসে শুনলাম, মা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করে বলছেন, "ওরে তোরা ওকে কিছু বলিসনে, ও যে আমার প্রিয়র নাম নিয়ে এসেছে। ওরে তোরা মারিস্‌নে—"

আমার প্রাণ ফেটে শব্দ উঠল "মা—মা—মা"। মাও আমার ছুটে বেরিয়ে এসে সেই আত্মীয়দের হাত ছাড়িয়ে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরে, সেই আত্মীয়দের বল্লাম, "তোমরা সব নাও—কিন্তু মাকে দাও। আমি আর কিছু চাইনে।"

আমার এই কথার উত্তরে যা শুনলাম, তা আর বলে কি করব? এই ত সংসার! এই ত সুখে-দুখে, ন্যায় অন্যায়ে ভরা সংসার। এই দুঃখে না পড়লে কি মাকে পেতাম, মাকে বুঝতাম। মা তাঁর ছেলের নামটুকুকেও এত ভালবাসেন যে সেই নামটুকুর

জন্যে আমার সঙ্গে চলে আসতে চাইলেন। তিনি বল্লেন, "চল বাবা তোমার সঙ্গে কাশী গয়া বৃন্দাবন করিগে। তুমি যেই হও, আমি তোমায় আমার প্রিয়ব্রতই বলে জানলাম।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর বল্লাম, "মা, বুঝলাম তুমি এখনও আমায় বিশ্বাস করনি—জটা গেরুয়াতে যেমন আমায় চিনতে দেয়নি, তেমনি এই নেড়া মাথা আর ছেঁড়া কাঁথাতেও চিনতে দিলে না। যাই হোক, আবার আমি আসব, তার পর দেখব কেমন আমার মা আমায় না নেয়।"

৪

হয় ত তোমরা জিজ্ঞাসা করবে যে, যখন আমার আপনার জনেরা আমায় অমনি করে মেরে ধরে তাড়িয়ে দিলে, তখন আমার দুঃখ হয়েছিল কি না? এবং তোমরা আশা করবে, যে আমি বলব—

"মেরেছ কলসির কাণা
তা বলে কি প্রেম দিব না?"

না গো, না, আমি কি আর সন্ন্যাসী আছি, যে অমনি করে বলব, "হে পিতঃ এই পাপীদের ক্ষমা কর, এরা জানে না যে এরা কি করছে।"

যাঁরা সে কথা বলেছিলেন তাঁরা জগদ্গুরু। তাঁরা আমার মাথায় থাকুন। আমি সহজ মানুষ—তাই মার খেয়ে কাঁদলাম। তাই এই পরম দুঃখকে দুঃখ বলেই স্বীকার করলাম। কিন্তু তবু তাদের আশীর্ব্বাদ করতে ভুললাম না—কারণ তাদের মার-ধরের মধ্যে আমি আমার মাকে পেলাম, তাঁদেরও পেলাম, এবং এই

দু'য়ের মধ্যে আমাকেও পেলাম। তাতে যে আমারই পরম লাভ হল। আমায় কাঁদিয়ে তাঁরা আমায় জাগালেন—আমি যে কাঁদতে ভুলে গিয়ে বৈশাখের আকাশের মত ফাঁকা শুকনো প্রকাণ্ড একটা কি হয়ে গিয়েছিলাম। সেই আকাশে যে আষাঢ়ের জলদোদয়ের প্রয়োজন ছিল। তাই এই অশ্রু মেঘের সঞ্চারকে পেয়ে আমার আত্মা অন্যথা বৃত্তিচেতঃ হয়ে বেঁচে উঠল। বসন্তকে ত্যাগ করে গ্রীষ্মে এতদিন কেটেছে, এইবার বর্ষার উদয় হয়েছে! আমিও কেঁদে বেঁচেছি। আমি যে সবাইকে শুদ্ধ আপনাকে পেয়ে বেঁচেছি। তাঁদের আশীর্ব্বাদ করব না?

তার পর কি হল? যা হবার তাই হল। সংসারের এক দরজায়—স্বার্থের দরজায়—প্রবেশ পেলাম না বলেই কি, অন্য দরজাতেও প্রবেশ নিষেধ হবে? আর, যে সংসারকে আমি অপমান করে ত্যাগ করে গিয়েছিলাম, সে যে আমায় সহজে প্রবেশ করতে দিলে না, সেটা কি খুবই অন্যায় করেছে? কখনই না। আঘাতের প্রতিঘাত না পেলে যে আমার আদর পাওয়াই হত—দুঃখ পাওয়া যে হ'ত না। তাই সেই পুনঃ প্রবেশের প্রথম ক'দিন, যে, সংসারের সিংহদ্বারে আমার মাথা ঠুকে গিয়েছিল, সে তো ঠিকই হয়েছে।

কিন্তু তার পরে আর এক দরজা দিয়ে সেই মা, সেই পরম মায়াবিনী জননী সংসার আমায় ডেকে নিলেন। কলকাতায় এক উকিল বন্ধু অবিনাশের কাছে, কিছু দিন পরে, গিয়ে উপস্থিত হতেই সে আদর করে ডেকে নিয়ে বল্লে, "আরে এ কে! প্রিয়! তুমি এই বেশে! তোমার লোটা কম্বল গেরুয়া জটা কৈ হে?"

আমি বল্লাম, "সব কেড়ে নিয়েছে ভাই, এমন কি জায়গাটুকু পর্য্যন্ত। এখন একটু জায়গা দেবে? নইলে যে আমি উবে যাই।"

সে তো হেসেই আকুল; বল্লে, "বেঙ্ থেকে কেঁচে আবার ব্যাঙাচী হলে ভাই! সেই হরিদ্বারের ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটের কথাগুলো মনে আছে? তখন যে সব লম্বা লম্বা বাত্ ঝেড়েছিলে, সে সব কি হল?"

আমি বল্লাম, "সব ঝেড়ে ফেলেছি ভাই, এখন তুমি আমায় ঝেড়ে ফেল না, এইটুকু প্রার্থনা।"

বন্ধু আমার সব কথা শুনে বল্লে, "এঁ, মাও তোমায় চিনলেন না? আশ্চর্য্য!"

আমি জীব কেটে বল্লাম, "ছি ছি, ও কথা বল না, মা ঠিকই চিনেছেন। তবে সবাই মিলে তাঁকে চিনতে দিলে না যে! যাক, ও কথা আর নয়, যখন দিন পাব তখন দেখো আমার মা মাই আছেন। এখন আমার একটা ব্যবস্থা কর।"

বন্ধু অবিনাশের কাছে কিছু দিন থাকার পর, ব্যবস্থা আপনিই হল; বন্ধু সারদাপুর গ্রামের তাঁর এক মক্কেলের এষ্টেটের ম্যানেজার করেআমায় চাপকান চোগা পরিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। বলে দিলেন যে, সম্পত্তির মালিকরা মেয়েমানুষ, এবং তাঁদের না কি সন্যিসী ফকিরে ভারী ভক্তি; আমি যখন জীবনের এতটা কাল সন্যিসীগিরি করিছি, তখন তাদের সঙ্গে খুব পোষাবে।

কিন্তু গ্রামের আর এষ্টেটের মৃত মালিকদের নাম শুনেই আমার যেন কেমন একটা চমক লাগল। এ যেন চেনা নাম! এ যেন কবে, কোথায় শুনিছি, তা যেন কিছুতেই ভাল করে

সাহস করে স্মরণে আনতে পারলাম না। কেমন ভয় মিশ্রিত আশায় আমার প্রাণটা চঞ্চল হয়ে উঠল। আমি একদিনও দেরী না করে বেরিয়ে পড়লাম। পথে আসতে আসতে কেবলি ভাবছিলাম, এ নাম কোথায় শুনিছি? আমার সমস্ত স্মৃতিটা তালপাকিয়ে জটপাকিয়ে মনের মাথার ওপর বসেছিল—কিছুতেই সে জটা ছিঁড়ে সেই স্মৃতির ধারাকে বহিয়ে বাইরে আনতে পারলাম না! কিন্তু সমস্ত অস্তিত্ব হ'তে ধ্বনি উঠতে লাগল—কোথায়—কোথায় কোথায় গো!

৫

কাজটা নিয়েই আমার দু'রকমের ভয় হয়েছিল। একটী হচ্ছে, একাজ পারব কি না। আর একটী ভয় হয়েছিল যে কিসের, তা প্রথমটা খুব খোলসা করে ধরতে পারিনি। কিন্তু যখন ধরতে পারলাম, কিসের ভয়, তখন ভয়ের কারণ ও পালিয়েছে। ব্যাপার দুটোর প্রথমটী এই :—

কাজটা ঘাড়ে নিয়ে ভয়ে ভয়ে সারদাপুরের রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌছিতেই দেখি, আমার জন্যে জমিদারের গাড়ী এসে উপস্থিত; এবং এমনি আদর করে কর্ম্মচারীরা আমায় ডেকে নিলে, যে জমিদার মহাশয়ের বৈঠকখানা পৌছুতেই আমার অর্দ্ধেক ভয় কেটে গেল। মন বল্লে, "নাঃ এদের ভয় করবার কিছু নেই।"

তারপর দু চার দিন সুস্থ হয়ে বাসায় বসতে না বসতেই, মালিকরা আমায় ডেকে পাঠালেন, এবং এমন অদ্ভুত ভাবে পর্দ্দার আড়াল হতে আমার ওপর হুকুম জারির সঙ্গে উপদেশ, এমন কি মৃদু তিরস্কার পর্য্যন্ত, বেরিয়ে এল যে আমার প্রথম ভয়টা

এক নিমেষেই লজ্জায় পালিয়ে গেল। আর এটাও ত' সত্য যে জলের মাছ জলে পড়লেই সাঁতার দিতে আরম্ভ করে—অবশ্য যদি সে একেবারে না মরে গিয়ে থাকে। আমি মরিনি, তাই এই অনভ্যস্ত কাজেও প্রথম দিন হতেই হারিনি।

যাক, আমি যাই সদর কাছারির পেছনকার ঘরের পর্দ্দার সুমুখে এসে দাঁড়ালাম, অমনি ভেতর হতে মধুর স্বরে হুকুম এল, "ঐ চেয়ার খানায় বসুন।"

আওয়াজ শুনেই কাণ জুড়িয়ে গেল, ইচ্ছে হল পর্দ্দাটার নীচে একটা প্রণাম ঠুকি, কিন্তু পারলাম না। বোধহয় অনভ্যাসে, কিম্বা হয়ত সঙ্কোচে, অথবা হয়তো তখনো এই চাপকান চোগার অন্তরালে সন্ন্যাসীটা লুকিয়ে বসে ছিল।

যে কারণেই হ'ক নমস্কার করা হলনা। কিন্তু ভেতর হতে শব্দ হল, "আপনি ব্রাহ্মণ, শুনিছি আমাদেরই স্বজাতি, আপনাকে নমস্কার করছি। আশীর্ব্বাদ করুন।"

আমি চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, "আশীর্ব্বাদ কর্‌ব? কি বলে আশীর্ব্বাদ করব?"

ভিতর হতে একটা মৃদু হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। তারপর শব্দ শুনলাম, "আশীর্ব্বাদ করতেও জানেন না? তা হলে এতবড় এষ্টেট চালাবেন কি করে?"

আমি মাথা চুলকিয়ে বল্‌লাম, "দেওয়ানজী বলেছেন, চালিয়ে নেবেন, তাই সাহস হয়েছে, পারব। ভুল হয় আপনারা দয়া করে শুধরে দেবেন।"

"তা হলে, প্রথম থেকেই ভুল শুধরে দিতে হবে দেখছি—আপনি একলা এসেছেন কেন? ঐ অত বড় বাড়িটা কি

আপনাকে একলা থাকবার জন্য দেওয়া হয়েছে? কেবল চাকর বামুনের হাতে আপনাকে আমরা ফেলে রাখব কি করে? উর্ম্মিলা দিদি, পিসিমা দুজনেই বলে দিয়েছেন যে, আপনি যদি আপনার ছেলে মেয়েদের না নিয়ে আসেন তা হলে এ বিদেশে আপনার মন টিকবে কি করে? মন দিয়ে কাজ কর্ম্ম করবেন কি করে? চুপ করে রৈলেন যে? একলা এই বিদেশে আসা কি আপনার ভুল হয়নি?"

একলা! বিদেশে! ওগো অন্তরাল বাসিনী! তুমি এ কি বুঝবে যে তোমাদের এই আশ্রয় প্রার্থিটী কতখানি একলা! তার স্বদেশকে পাবার জন্য তার মধ্যে যে কত হাহাকার তা কি অনুভব করতে পারবে?

যাক, আমি অবাক হয়ে এই অপরিচিতার পরিচয়ের সঙ্গে এই অদ্ভুৎ সম্ভাষণের ভঙ্গীর মধ্যেই ডুবে গিয়েছিলাম। তাই তিনি যখন বল্লেন, "চুপ করে আছেন কেন?" তখন আমি চমকে উঠে বল্লাম, "ছেলে মেয়ে আমার কেউ নেই, এক আছেন মা,—"

"কেউ নেই! ছি ছি শীগ্‌গির মাকে আনতে পাঠান। আজই চিঠি লিখেদেন, না হয় নিজে যান। না—এমন করে আপনার থাকা হবে না।"

আহা! কেগো করুণাময়ী, এই অপরিচিতকে অন্তরালে থেকে এমনি করে সহজেই আপনার করে নিলে! কেগো এমনি করে আমায় আমার স্ব-কৃত মরুভুমী হতে এক নিমেষে আনায়াসলব্ধ ওয়েশিষে পৌছে দিলে! ওগো তোমায় কি বলে আশীর্ব্বাদ করব? তুমি যেথানে আছ সে স্থান বুঝি একেবারে

কমলালয়, একেবারে পূর্ণের দেশ! ওগো অন্তরাল বাসিনী, তুমি অন্তরালেই থাক, আর যেথানেই থাক, তবু তোমায় না জেনেই জানলাম, না চিনেই চিনলাম, না, দেখেই দেখলাম।

আমি কোনো উত্তর করলাম না বলেই বোধ হয় পর্দ্দাখানি নড়ে উঠল, এবং দুখানি চরণ কমল পর্দ্দার নীচে দেখা গেল। বোধ হল যেন পর্দ্দাভেদ করে সেই অপরিচিতা আমার পরিচয় নেবার চেষ্টা করছেন। তারপর আবার মধুর স্বরে হুকুম এল, "আপনি মাকে চিঠি লিখবেন ত? দেরী করবেন না ত'।"

না দেবী না, দেরী করা আর হবে না। কি করে দেরী করব? এমন স্থানে এমন আদরের মধ্যে মাকে যে আমার আর না হলেই নয়। মাকে আর দূরে রাখব কি করে?

আমি বল্লাম, "আমি আজই পত্র লিখে দিচ্ছি, কিন্তু তিনি—"

"তিনি আসবেন না? ছেলে ফেলে দূরে থাকবেন? তা কি কখন হয়?"

"গঙ্গাহীন দেশে—"

"গঙ্গাহীন দেশ—হলই বা গঙ্গাহীন দেশ, কিন্তু ছেলেকে ফেলে কি করে তিনি থাকবেন? ছেলের চেয়ে গঙ্গা বড়! না—না সে হবে না, আপনি নিজে গিয়ে নিয়ে আসুন, নইলে যা শুনিছি তাতে বুঝছি যে আপনি এ রকম করে থাকলে বাঁচবেন না—অন্ততঃ বেশীদিন এখানে টিকতে পারবেন না।"

আশ্চর্য্য! এই অদ্ভুত মানুষটী অন্তরাল হতে আমার কতখানি লক্ষ্য করেছে। না জানি এর দৃষ্টি কতদূর যায়!

আমি অবাক হয়ে সেই কাঠের চেয়ার খানার ওপর কাঠের

মত বসে রৈলাম। তারপর দেখলাম পা দু'খানি হঠাৎ সরে গেল—অনুভব হল যেন কে আর একজন ঐ ঘরে এলেন। তিনি এসেই বল্লেন, "বাবা, তোমায় আমাদের বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলতে ডাকিনি, কারণ সে বিষয়ে দেওয়ানজীই তোমায় সব বুঝিয়ে দেবেন। আর তুমি শুনিছি খুব বিদ্বান বুদ্ধিমান, জ্ঞানী মানুষ—অবিনাশ বাবু উকিল তোমায় বিষয় অনেক কথাই লিখেছেন। তাই বিষয় সম্বন্ধে আর কি বলব? কিন্তু, বাবা, আমরা মেয়ে মানুষ আমাদের আগে চোখ পড়ে, যারা আমাদের কাছে এসে পড়েছে, তারা কষ্ট পাচ্ছে কিনা, সেই দিকে। আমি শুনলাম, তুমি নিজে হাতে সব কর, চাকর বামুনের কিছু করতে দাও না। তারা মুস্কিলে পড়ে আমার কাছে এসে জানিয়েছে। এ রকম করলে ত' চলবে না বাবা। কেন ওদের কাজ করতে দাও না?"

আমি হেসে ফেল্লাম, কিছু বল্লাম না—অমনি সেই আর একটী মধুর স্বরের মানুষটীর রাগের সুরে শব্দ হল, "না পিসীমা, ও রকম মানুষ নিয়ে চলবে না, ওঁর মা আছেন, হয় তাঁকে উনি নিয়ে আসুন—না হয় আমাদের ঠাকুর বাড়ীতে এসে রোজ প্রসাদ পেয়ে যান। অমন করে উপবাসী হয়ে থাকবার কারো অধিকার নেই, তাতে গেরস্তর অকল্যান হবে যে!"

মা বল্লেন,—মা! হ্যা মাইত—মা বল্লেন "কেন বাবা, তোমার চাকর বামুনদের খাটতে দাওনা? বিছনায় শোওনা—খাওনা দাওনা, কেবল চুপ করে কি ভাব?"

এ কথার কি উত্তর দেব? আমি এসিছি সন্ন্যাসীমহারাজগিরি ছেড়ে চাকর হতে, আমার আবার চাকর! কিন্তু এ কথা কি

এরা বুঝবে? আর সে কথা বলেই বা কি হবে? তাই মৃদুস্বরে বল্লাম, "আমি সামান্য মানুষ—আমার কিই বা কাজ আছে যে ওরা করবে?"

কিন্তু একথা হতে নানা কথা, নানা অনুরোধ উপরোধ দেখাদিল এবং তারফলে কিছুদিনের মধ্যেই আমার মা স্বয়ং এসে উপস্থিত হলেন। কি করে? অতি সহজে। বন্ধু অবিনাশ এবং আরও কে কে গিয়ে মাকে যখন বুঝিয়ে দিলেন তখন আর কি তিনি থাকতে পারেন? তিনি সব ফেলে চলে এলেন। আমিও মাকে জড়িয়ে ধরে বল্লাম—

"বেশ করেছ মা—ছেলের চাইতে কি বিষয় বড়? ওরা যা চাচ্ছে তাই নেক গিয়ে, তুমি ছেলে চাচ্ছ তাই নাও।"

মাত কেঁদে কেটে আদর আব্দারে আমায় ডুবিয়ে এই এত বছরের বিরহের দুঃখ এক মুহূর্ত্তে মুছে ফেললেন। আমিও তাঁর কোলে মাথা রেখে কত কাল পরে ঘুমুলাম। আঃ সে কি ঘুম! হাজার বছরের জমাট নিদ্রা আমার প্রাণের ওপর যেন চেপে বসল—আমি কাজ কর্ম্ম কর্ত্তব্য সব ভুলে মায়ের কোল আঁকড়ে পড়ে রৈলাম। যে ঘুমকে ঘুম পাড়িয়ে ছিলাম সে আজ প্রতিশোধ নিলে—আমিও ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলাম যেন আমি এতটুকু হয়ে মার কোল জুড়ে অতি সহজেই পড়ে আছি।

কিন্তু যখন ঘুম ভাঙ্গল, তখন অনুভব হল, মা আমার মাথাটা কোলে নিয়েই বসে আছেন এবং মৃদু স্বরে কার সঙ্গে কথা বলছেন। আমার উঠতে ইচ্ছা করছিল না, কিন্তু তবু উঠতে হল; কারণ এমন ভাবে পড়ে থাকা ত' সহজ অবস্থায় যায়

না, বিশেষতঃ অপরের সামনে। তাই উঠে বসতেই হল। কিন্তু উঠে দেখি, এ কি মূর্ত্তি! সে মূর্ত্তি বুঝি এমনি করে ঘুম থেকে উঠেই দেখবার! এ মূর্ত্তি দেখাই বুঝি ঘুম ভাঙ্গার সার্থকতা! মায়ের অভাবে যে মূর্ত্তি পরদার আড়ালে ছিল, মায়ের মাঝে সেই মূর্ত্তি সামনে এসে দাঁড়িয়েছে!

মূর্ত্তি অপরূপ হাসি হেসে বল্লেন, "আমি, মা এসেছেন শুনেই, দেখতে আসছিলাম, পিসীমা বারণ করলেন। তাই, সকালে না এসে এ বেলায় এলাম, কিন্তু আপনি যে এখনো এত শিশু তা জানলে হয়ত অন্ততঃ মাস খানেক দেরী করে আসতাম!"

মা আমার হাসতে হাসতে বল্লেন, "ও যে আমার হারানো শিশু—ওযে আমার কি শিশু তা একদিন বলব মা। ওরে প্রিয়, তুই কাছারী যাবিনে? তোর পেয়াদা যে এসে বসে আছে, কাছারীতে না কি কে সাহেব এসেছে, তোকে ডেকে পাঠিয়েছে।"

আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, "মা তোমায় যে কথা বলেছি তা যেন ভুলে যেওনা—কথার ঝোঁকে যা' তা' বলে এঁদের ব্যস্ত ক'র না। আমি আসার পর হতেই এঁরা আমায় নিয়ে যে রকম ব্যস্ত হয়েছিলেন তাতেই বলছি, যে, ছেলের আদর বাড়াবার জন্যে যাতা কতকগুলি কথার ঝুড়ি এঁদের শুনিয়ে কাজ নাই।"

আমার কথার ভঙ্গীতেই বোধ হয় হাসি দেবীর মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। কেমন যেন একটু ভয়ে ভয়ে তিনি একবার আমার দিকে চেয়ে তারপর মার দিকে ফিরে বল্লেন, "এঁর বিষয় গোপন করবার কি কিছু আছে?" মা বল্লেন, "কি জানি মা, ও আমায় ওর বিষয় কোনো কথা বলতে মানা করে দিয়েছে।

যাক, ভয় নেই মা, ও যা বলতে বারণ করেছে তাতে এমন কিছু নেই যা তোমাদের ভয় পাবার কারণ হবে।"

হাসি দেবী তবু হাসলেন না। আমিও বেরিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু এই হাস্যযশা হাসিদেবীর ভীত মুখ যেন আমাকেও একটু অস্বস্তি এনে দিলে। মন কেবলি বলতে লাগল—ওগো হাস্যময়ি তুমি হাস! যে হাসি হতে কেউ বঞ্চিত হয় না, সে হাসি হতে আমি যেন বঞ্চিত না হই।

৬

এইবার আমার দ্বিতীয় ভয়টা কি এবং কি করে সেটা গেল সেই কথাটী বলব। কিন্তু একথাগুলো বলতে কেমন যেন লজ্জা করছে! লজ্জা? হ্যাঁ লজ্জাইত—আমি যে একেবারে সহজ মানুষ হয়ে গিয়েছি, আমার লজ্জা করবে না?

কিন্তু কিসের লজ্জা? লজ্জা এই, যে, আমি যাঁর দাসত্ব করতে ফিরে এসিছি, এখানে দুদিন থেকেই বুঝলাম তিনিই আমার এই এখানকার মালিক—এক অপূর্ব্ব দিনে অপূর্ব্ব অবস্থায় এঁকেই, আজকের এই অন্তরালবর্ত্তিনীকেই, চিরন্তরালের বাইরে রাণীরূপেই পেয়েছিলাম। বিশ্বমায়াময়ীর অপূর্ব্ব মায়ায় আজ আমি, না জেনে না ইচ্ছে করে, সেই ইচ্ছাময়ীর (আমারই প্রতিষ্ঠিত) প্রতীকের সেবা করতে এসে পড়িছি। জগতের চিরন্তনী ইচ্ছাময়ী যে কি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী তাই দেখতে পেয়ে ভয়ে লজ্জায় আনন্দে আমি একেবারে এতটুকু হয়ে, এই আমার মন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু ইচ্ছাময়ীর বাহ্য প্রতীক এখন গোপনতার অন্তরালে লুকিয়েছেন। আমি এখন এই মন্দিরের

গোপুরমে দাঁড়িয়ে আঁধার মন্দিরের গোপনতার দিকে চেয়ে আছি। মনে আশা—মন্দিরের দরজা কি খুলবে না—দেখতে কি আর পাব না? তিরস্করিণীর আবরণ কি সরবে না?

নাই বা সরল, তবু জানছি যে তুমি আছ; সেই যে যথেষ্ট! গোপন হয়ে আমার মধ্যে আশা জাগিয়ে, ব্যথা জাগিয়ে, আমার সব জাগিয়ে আছ—আছ, এই যে আমার পরম লাভ! একেবারে সমস্ত অন্তরাল লোপ করে তোমায় পেলে যে সব দুঃখ লোপ পেত, জড় হয়ে যেতাম; না না—তা চাই না। ওগো দয়াময়ি, তোমার এই দুঃখ দেওয়াই যে পরম সুখ দেওয়া। এই ধরা না দিয়ে ধরা দেওয়াই যে পরম আনন্দ দেওয়া। একেবারে মুখোমুখি দেখার ভয়ঙ্কর সুখ আর চাই না—আমি চাই না। এখন ভুল করতেই শেখাও। সত্যিকে একভাবে খুব দেখে নিয়েছি, ভয়ঙ্কর দেখিছি—সে যে সুখ দুঃখের বাইরে। ওগো, সে সত্যকে নিয়ে আনন্দ নেই। যে আনন্দের অভাবে যে আনন্দের তাড়নে একদিন জগৎসৃষ্টি হয়েছিল সেই আদি ভুলে ভুলে থাকতে চাই যে। ভুল? আচ্ছা ভুলই সই, তবু তাকেই চাই।

কি বলতে গিয়ে কি সব বাজে কথা লিখে ফেল্লাম। এ সব সহজ মানুষের কথা নয় যে। ওকথা আর বলব না—এই কাণ মলছি! ক্ষমা কর, ভাই ক্ষমা কর—আর কখনো বলব না।

আমি বলছিলাম, যে, আমার ভয় হয়েছিল, যে, কোন দিন বুঝি ধরা পড়ে যাব; আমার এই লুকোচুরী বুঝি কোন দিন এঁদের কাছে একেবারে খোলসা হয়ে যাবে, আর আমার এই অপরূপ দাসত্বের খেলা ফুরিয়ে যাবে! কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই বুঝতে পারলাম, যে, না—সে ভয় নেই; কারণ যাকে

গর্ভধারিণীই চিনতে পারেন নি তাকে কি করে এঁরা চিনবেন ?—বিশেষতঃ এই অত্যন্ত সহজ বেশে। প্রথম যখন এঁদের কাছে এসেছিলাম, তখন একেবারে সত্যাশ্রয়ী জ্ঞানাশ্রয়ী সন্ন্যাসী মানুষ। তাঁরা সেই অসহজ মানুষকে এই সহজ মানুষের মধ্যে ধরতে পারবেন কি করে ? তখন ছিল গেরুয়া এখন হয়েছে পেন্টুলান, না হয় ধুতি চাদর ; তখন মাথায় ছিল জটা এখন মাথায় আছে টেরী ; তখন শরীরে ছিল দীপ্তি আর শক্তি, এখন সেইখানে এসে জুটেছে কান্তি আর পুষ্টি ! এ দেহের মধ্যে তাকে কোথায় পাবে যাকে পাবার জন্তে শুনিছি এই এত বড় সংসারটা সমস্ত ভারতবর্ষের বৈরাগ্য-লোকের ধ্রুবলোকের দিকে চেয়ে বসে আছে। যাকে পাবার জন্য ঐ অত বড় একটা ধর্ম্মশালা হয়েছে—যাতে অন্ততঃ একটী সন্ন্যাসীও যেন দিনান্তে একবার এঁদের চোখে পড়েন। এবং আরও শুনেছি নাকি কে একজন স্বামীজী আজ কত দিন হতে এঁদের ঐ পুকুরটার দক্ষিণ বাগানের মধ্যে ষোড়শোপচারে পূজা পাচ্ছেন। তিনি যে কে এখন পর্য্যন্ত তা কেউ জানে না। কেবল একটা সন্দেহ, কেবল একটা 'হলেও হতে পারে' এই আশঙ্কার জোরে তিনি ঠাকুরের মত পূজা পাচ্ছেন। কে তিনি তা জানিনে, জানতে চেষ্টাও করিনি, কারণ সহজ মানুষ অসহজ মানুষের কাজে যেতে ভয় পাবে না কি ? আমি চাকরী করতে এসেছি, দাসের কি স্বামীর কাছে, অতি কাছে যাওয়া ভাল দেখায় ?

আমি স্বামীজীকে দেখতে যাই নি, তার নানা কারণের মধ্যে বড় কারণটা যে কি তা বলব কি ? আচ্ছা বলছি, ভাই, কিচ্ছু গোপন করব না।

এই যে অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে এসে পড়িছি এটার মধ্যে ভারি একটা লোভের জিনিষ পেয়েছিলাম। এই যে লুকোচুরী; এই যে গোপনতা, এইটাই যেন ভারী একটা লাভ বলে মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এই যে প্রভু হবার জায়গায় জেনে শুনে দাস হতে পেয়েছি এইটেই যে মায়ের আমার পরম দয়া, পরম স্নেহ দেখান। এ অবস্থা কি সহজে ছাড়া যায়—এই সহজ হবার মধ্যে এসে একটু অসহজ হওয়া, এও যে আনন্দের জিনিষ, এও যে লোভের জিনিষ। আমি যে এখন বড্ড লোভী হয়ে উঠেছি! আমি চিরদিন অসহজকে অভ্যাস করে এসিছি কিনা, তাই এখানে এসেও সে আমার অজ্ঞাতে আমায় পেয়ে বসেছে, আমার এই দোষটুকু ক্ষমা কর ভাই। যেটা 'আপসে আতা হায়' তাকে আসতে দিলে কি খুবই দোষ হবে?

আর দোষই বা কার? এখন যদি চট করে বলে বসি, যে "তোমরা আমাকেই খুঁজছ—যাকে খুঁজছ সে আর কেউ নয় এই চাপকান চোগা টেরী ছড়ী ধারী আমি। ঐ গেরুয়া জটা চিমটে ধারীর মধ্যে তোমাদের সেই খোঁজার বস্তু নেই, যার মধ্যে আছে তাকে তোমরা ধরেও ধরতে পারনি, পেয়েও পাবে না।" একথা এখন বল্লে এঁরা কি তা বিশ্বাস করবেন? না-করাই ত' সহজ, বিশ্বাস করাই ত' অসহজ। আমি সহজের সেবক হয়ে কি করে সে কাজ করতে দেব এঁদের? আর করতে বল্লেই বা তা এঁরা করবেন কেন? হয় ত বলতে গেলে ফলে, আমার এই যে মুফতে পাওয়া মস্ত আনন্দ টুকু ভোগ করবার উপায় হয়েছে, তাও যে চলে যাবার সম্ভাবনা। না না, আমি বড্ড লোভী ভাই, আমি এ আনন্দের লোভ ছাড়তে পারব না; এই

সুখ-দুঃখের এই আশা-নিরাশার দোলে দোলার আনন্দ হতে তোমরা বঞ্চিত হতে বলনা। আমি পারব না, কিছুতেই না। যো আপ্‌সে আয়া উসকো আনে দিয়া—আনে দেও ভাইয়া আনে দেও। আওর ইসমে জো কসুর হায় উসকো ভি জানে দেও।

বাধা দেওয়া হবে না, জোর করা হবে না। বাপ্‌রে! আবার জোরা-জোরী—এই জোয়া-জোরীতে পড়ে এই ১৫।১৬ বছরটা কোন দিক দিয়ে চলে গেল তার হিসেবই নাই। এই ক'বছরের যে লোকসান হয়েছে তারই ঠেলা কি করে সামলাব। আবার বাধা দেওয়া? গতির বিরুদ্ধে উজান টানা? না ভাই আর নয়। এখন গা ভাসান দিয়েছি, ভাসতে শিখেছি, আর ভয় কি—এখন ভেসে চলব। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছায় ভাসছি, এ বোধ হতে ত', এ আনন্দ হতে ত' কেউ আমায় বঞ্চিত করতে পারবে না? বাস্ তা হলেই হল। থাকা নিয়েই কথা; যখন আছি, তখন আছি বলেই থেকে গেলাম—বাস্ আউর কেয়া?

যাক, যে কথা বলছিলাম তাই বলি। এরা আমায় কেউ চিনলে না। আমিও বেঁচে গেলাম, মুক্তির সঙ্গে বন্ধনের দুঃখ আকণ্ঠ পান করতে আরম্ভ করলাম। যাঁর দাসত্ব করতে এসেছি, মুক্তভাবে তাঁরই দাসত্ব করতে আরম্ভ করলাম। তিনি দেখলেন না—তিনি জানলেন না, তবু তাঁর কাছে তাঁর না-চাওয়া পূজা পৌঁছে দিয়ে আমি বড় আনন্দে আছি ভাই। এই যে প্রতিপদে ব্যথা পাচ্ছি, প্রতিপদে মনে হচ্ছে বলি, "একবার, ওগো অন্তরালবাসিনী, কৃপা করে এই দীনের পূজোপহারের দিকে চেয়ে, তোমার চোখের মধ্যে দিয়ে সেই পরম মায়াবিনীর চোখের সুমুখে আমার নৈবেদ্যগুলো পৌঁছে দাও"—কিন্তু প্রতিবারে বাধা

পেয়ে ফিরে আসছি, এতে কি আনন্দ কি মুক্তি! কি বেদনা কি বন্ধন! ওগো এই বেদনার বন্ধন আমার অক্ষয় হোক, তোমরা এই পরম লোভীকে পরম কামুককে সেই আশীর্ব্বাদ কর!

৭

কিন্তু আমার এই বিফল পূজার পূর্ণ ফলও যে একজন নিজে বয়ে এনে দিচ্ছে, তার কথা যেন বলতে না ভুলি। সে কে? সে দয়াময়ী হাসিদেবী—বিশ্বের হাসির প্রতীক নয়, একেবারে জীবন্ত প্রতিমা, বিশ্বলক্ষ্মীর মূর্ত্ত বিগ্রহ! এ যে কেন এমনি ভাবে আমার মায়ের আড়াল হতে আমাকে ঘিরে ফেললে তা যে বুঝতে পারছি নে! তা কি কেউ তোমরা বুঝিয়ে দেবে? আমার স্বর্গগত মালিকের মহা বৈরাগীর সংসারে এমন লক্ষ্মীর চরণ পদ্মটী কি করে ফুটল? কে ফোটালে? কার জন্মে ফোটালে?

কার জন্যে ফোটালে? আমারি জন্যে। আমারই জন্যে যার আকাশে বাতাসে জলে স্থলে সাড়া পড়ে গিয়েছিল সেই ফোটালে; যার বিশ্বমানসে প্রত্যেকের জন্য সবের, সবারই জন্যে প্রত্যেকের জন্ম হয়, তারই এই কারসাজী। কিন্তু কারসাজী ধরা পড়ে যাচ্ছে। এইটেই সেই চিরন্তনী বোকা মেয়ে বুঝি বুঝছে না।

বুঝছে না? তাই বা কেমন করে হবে? সে যদি না বোঝে ত' এই হাসিই বা কি করে সব বুঝে ফেলে। আমার কি চাই, কোন্ সময় কোন্ মুহূর্ত্তে কি দরকার তা সবই কি করে এ বুঝলে? আমার ঘরখানা কি করে ঠিক এমনি ভাবে

মন ভুলান হয়ে উঠ্‌ল। এমন সব ছবি—এমন ফুলের অর্ঘ্য, এমন বিচিত্র মালা, এমন সব রঙ্গিন খেলনায় কেন এই ভিখারীর ঘরখানা ভরে উঠ্‌ল!

আবার ঐ অত শোভার সম্ভারের মাঝখানে এমন একটা ভিখারীর ছবিকে এমনি ভাবে শ্বেত পাথরের হোয়াট্‌নটের ওপর গোলাপ আর পদ্মের মালার ফ্রেমে কেন সে বসিয়ে দিয়েছে? এই এত রূপের, এত আলোর মাঝখানে ঐ ভিক্ষাপাত্র হাতে জগদেক-ভিখারী বুদ্ধদেবকে কেন সে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে? সে কি প্রায় প্রথম দর্শন হতেই টের পায়নি? সে কি না জেনেও জানে নি, যে অমনি করে তাদেরই দ্বারে এই হতভাগা কামুকটা পতিত মানুষটা দাঁড়িয়ে আছে?

সে টের পেয়েছে ভাই, অনেক আগেই টের পেয়েছে, কারণ যে সবারই সব খোঁজ রাখে, যার কাছে কিছুই হারায় না সেই সর্ব্বনাশী সর্ব্বলোলুপাই যে এই মায়াবিনী মানুষটীর প্রাণের মধ্যে, মনের মধ্যে ঢুকে এর অন্তর বাহির সবটুকুকে তাতিয়ে রাঙ্গিয়ে ভরিয়ে তুলছে।

কিন্তু আমি কবে এবং কি করে এ কথা জানতে পারলাম? সে একটা গোপন কথা—তবু বলতে হবে? আচ্ছা বলছি। আমার মধ্যে যে একটুও আড়াল রাখতে দেবেনা তোমার তা জানি, আমার সব অহংকার যে তোমরা ধূলোয় মিশিয়ে দেবে তা আগেই বুঝতে পেরেছি। তবে শোনো—

আমার একখানা ফটোগ্রাফ ছিল, ঠিক আমার নয় আমাদের তিন জনের। আমার যিনি সেই যোগীগুরু—মন্ত্রগুরু জ্ঞানগুরু তিনি, আর সেই আমার হিমালয়ের পথের সাথী সখা এবং কর্ম্মগুরু

সেই তুরিয়ানন্দ স্বামী আর এই অধম মানুষটা এই তিনজনের তখনকার চেহারার ফটোগ্রাফ, আমার গুরুদেবের এক শিষ্য তুলে আমাদের তিন জনকে দিয়েছিলেন। আমি তা যত্ন করে ঝোলায় রেখেছিলাম, এবং এখনো ওটা রেখেছি। কেন? তা কি বলতে হবে? এই শরীরটার ওপর, এই বিকশিত আমিটার ওপর চিরদিনই আমার বোধ হয় লোভ ছিল! তাই রেখেছিলাম—ফেলিনি।

কিন্তু ফটোগ্রাফখানা বেরুল কি করে, তা ঠিক বুঝতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি, যে আমার জিনিষপত্র ঘাঁটা মার যেমন একটা কাজ হয়েছিল, বোধ হয় হাসিদেবীরও একটা কাজ হয়েছিল। আমি যখন এ ষ্টেটের কাজে বাইরে থাকতাম, তখন এই দুটী নারী-হৃদয় আমাকে নিয়ে কি যে করত তার সঠিক খবর আমি দিতে পারব না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, মা আমার সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া যা কিছু বলবার সবই বলে ফেলেছিলেন। এবং সেই আমার যেটুকু অংশ ধরা পড়েছিল তা নিশ্চয়ই এই অদ্ভুত নারীর মনে এমন একটা আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল যাতে এই সেবাপরায়ণাকে আমার জন্য অনেক সময়েই ভাবিয়ে তুলত।

সেই ভাবনাকে মূল করে এই ফটোখানার ওপর সেদিন মার সঙ্গে তাঁর তর্ক হচ্ছিল। আমি তখন সবেমাত্র কাছারী হ'তে ফিরে মার কাছে উপস্থিত হয়েছি। আমাকে দেখে তাঁদের তর্ক থেমে গেল। হাসি তাড়াতাড়ি ফটোখানি লুকালে। মা কিন্তু সে লুকোচুরী রাখতে দিলেন না—ফটোখানা কেড়ে নিয়ে বল্লেন, 'প্রিয়, তোর বাক্সে এ কাদের ফটো রে?'

আমি চমকে বল্লাম, 'কৈ দেখি।' ফটোখানা হাতে পেয়েই আমার হাত কাঁপতে লাগল—আমি বল্লাম, 'কেন বল ত? এদের কি তোমরা চেন নাকি?'

মা বল্লেন, 'আমি ত' একজনকেও চিনতে পারছি নে, তবে এই মানুষটার মুখ যেন চেনা চেনা মনে হচ্চে।'

'কার মত মনে হচ্চে?'

'যেন তোরই মত।'

আমার মুখটা তখন কি রকম হয়েছিল বলতে পারি না, কিন্তু বুকের মধ্যে যে একটা তোলপাড় চলছিল সেটা গোপন করব না। আমি ভয়ে ভয়ে বল্লাম, 'হলেই বা আমার মত, আমিই যে তা ত জোর করে বলতে পার না?'

মা দেখে দেখে বল্লেন, 'না, তা ঠিক বলা যায় না।'

আমি হাঁফ ছেড়ে বল্লাম, 'ও আমার তিনটি চেনা লোকের ছবি। কিন্তু এটা তোমরা পেলে কোথায়?'

মা এইবার ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, 'তোর বাক্সর মধ্যেই পেয়েছি। বাক্স গোছাতে গিয়ে—'

আমি একবার হাসির মুখের দিকে চাইলাম তারপর বল্লাম, 'তা বেশ করেছ, তাতে আর এত ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লে কেন? এখন দাও ওখানা রেখে দিই—ওদের তোমরা চেন না; কি করে চিনবে?'

এইবার হাসি কথা কইলে, বল্লে, 'আমি কিন্তু ওর মধ্যে দু জনকে অন্ততঃ ধরতে পেরেছি বলে মনে হয়।'

আমি প্রাণপণ বলে জোর করে বল্লাম, 'আপনি ত' আর কালিদাস নন যে বিক্রমাদিত্যের স্ত্রী ভানুমতীর তিলটী হ'তে বনের বাঘ ভালুকের কথা পর্য্যন্ত বলতে পারবেন। আপনাদের

বাড়ীতে বহুদিন হ'তে সন্ন্যিসী মহারাজরা যাতায়াত করছেন, হয়তো কারুর সঙ্গে এদের মুখের সাদৃশ আছে। তাই বলে এরাই যে তারা তার কোনো মানে নেই, অন্ততঃ একটীর বিষয় আমি ঠিক জানি যে আপনারা কখনো তাকে দেখেন নি।'

হাসি বল্লে, 'কোন্‌টির বিষয় শুনি?' আমি আমার চেহারাটা দেখিয়ে বল্লাম 'অন্ততঃ একে কখনো দেখেন নি!'

'কি করে জানলেন?' আমি জেরায় পড়ে জব্দ হবার মত হলাম, তবু সাহসে ভর করে বল্লাম, 'আমার ইনি খুব চেনা লোক, ইনি কখনো এখানে আসেন নি তা জানি।'

হাসি হাসিহীন মুখে উজ্জ্বল চোখে একবার আমার দিকে চাইলে, তারপর বল্লে, 'ঠিক জানেন আসেন নি?'

আমি বল্লাম, 'ঠিক জানি, ইনি ঠিক ইনিই কখনো আসেন নি। আপনি কেন বিশ্বাস করছেন না?—'

আমার কথা শেষ হ'তে না দিয়ে হাসি বল্লে, 'বিশ্বাস করা না করা ত' আমার হাত নয়। যাক, ও নিয়ে তর্ক করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু এই আর একটী লোককে যে আমি দেখেছি, এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বল্লাম, 'সে কি! কবে দেখেছেন? কোথায় দেখেছেন?'

'এইখানে, ঘণ্টা দুই আগে।'

আমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লাম। হাতের ফটোখানা যে কি জোরে কাঁপতে লাগল তা বলতে পারিনে। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সামলে নিয়ে বল্লাম, 'ইনি এইখানেই আছেন, আর আমি জানি নে! আশ্চর্য্য!'

হাসি এইবার হেসে উঠলেন, কিন্তু সে হাসিটা যে ঠিক হাসির মত শুনিয়েছিল তা যেন মনে হল না। হাসি বল্লে, 'আপনি অনেক খোঁজই রাখেন না; যাক, আপনার এক বন্ধুর খোঁজ দিলাম যদি দেখা করতে চান ত' বড় বাগানে গিয়ে দেখা করে আসবেন।'

মা এতক্ষণ চুপ করে এই প্রগল্‌ভা রমণীর কথা শুনছিলেন। কি যে তাঁর মনে হচ্ছিল জানি না, কিন্তু আমি যে খুব একটা মুস্কিলে পড়েছি তা বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাড়াতাড়ি বল্লেন, 'সাধু দর্শন! সে তো খুব ভালকথা, আজই আমায় নিয়ে চল না মা আমি দেখে আসি। প্রিয় যখন সময় পাবে যাবে অখন, এখন ওর জলখাবারটা এনে দিই তুমি দাঁড়াও।'

হাসি কিন্তু দাঁড়াল না—বল্লে, 'না মা এখন নয়, দিদি হয়ত আমায় খুঁজছে, তার সন্নিসী-পূজোর সময় উত্তীর্ণ হচ্ছে, আমি যাই, কাল আপনাকে নিয়ে যাব।'

হাসি চলে গেল—মা'ও বেরিয়ে গেলেন, আমি কেবল অবাক হয়ে যে পথে ঐ অপূর্ব্ব নারীমূর্ত্তি অন্তর্ধান করলে সে দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলাম।

৮

তার পর এক দিনে এক সময়েই আমার দুই গুরুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—একজন আমার আত্মতত্ত্বের গুরু, আর একজন আমার পরতত্ত্বের গুরু। একজন আমায় পরম-একত্বের আস্বাদ

পাইয়ে দিয়েছেন—আর একজন আমায় পরমানন্দের জন্য ডাক দিয়েছেন এবং এখানে টেনে এনেছেন। আমি আবার এক সঙ্গে দুই তত্ত্বের দুই গুরুকেই একই নিমিষে কাছে পেলাম। কেমন করে ? বলছি—

আমি হাসির কথা শুনে সেই রাত্রেই বড় বাগানে যাব মনে করেছিলাম, কিন্তু পারলাম না। তাই খুব সকালে উঠেই, মুখ হাত ধুয়ে সাধু দর্শনের উপযুক্ত বেশে বড় বাগানে চলে গেলাম। আশা ছিল, এত ভোরে নিশ্চই আর কেউ সেখানে যায় নি। আমি বাগানের গেট্ ঠেলে প্রবেশ করে আগে দেখে নিলাম, যে দিক থেকে মেয়েদের আসার সম্ভাবনা সে দিকটায় কাউকে দেখা যাচ্ছে কিনা। কাউকে দেখতে পেলাম না—ভরসা হল কেউ নেই। সাহসে ভর করে এগুতে লাগলাম। কিন্তু বেশী দূর যেতে না যেতেই দেখি বাগানের মধ্যেই সন্ন্যাসী ঠাকুর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন—যেন পাথরের মূর্ত্তি।

কি সুন্দর দেখাচ্ছিল তাঁকে—কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! বৈরাগ্য কি এত সুন্দর! ব্রহ্মচর্য্য কি এত জ্যোতিষ্মান! এরই মধ্যে কি আমায় খুঁজছে কেউ? এই এমন আগুনের মধ্যে কি আমার মত পতঙ্গের অস্তিত্ব থাকতে পারে? যিনি এর মধ্যে আমায় খুঁজছেন তাঁর না জানি কিসের চোখ! তিনি না জানি আমায় কি চোখে দেখেছিলেন!

আমি দেখতে দেখতে তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সন্ন্যাসী ফিরেও চাইলেন না। তখন ধীরে ধীরে তাঁর পায়ের কাছে গোটাদুই ফুল রেখে প্রণাম করতেই তিনি ফিরে না চেয়েই বল্লেন, ‘কোন্ হো বাচ্ছা?’ কি জানি কেন আমার মুখ দিয়ে

বেরিয়ে গেল 'ময় ভুখা হুঁ।' সন্ন্যাসী দূর আকাশ হতে চমকে চোখ নামিয়ে বল্লেন, 'ক্যা বোলা ?'

'একি! কে তুমি? তুমি সত্যানন্দ না? তুমি এখানে—এ বেশে?'

আমি উঠে দাঁড়ালাম। বন্ধু অমনি আমায় জড়িয়ে ধরলেন। অমনি আমার ভক্তির বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে প্রেমের জোয়ার ঠেলে এল। আমি কেঁদে ফেল্লাম!, তুরিয়ানন্দও কেঁদে ফেল্লেন—তাঁর সন্ন্যাসীগিরির একটুও অবশিষ্ট রইল না।

তখন আমরা দু'জনে বাগানের এক কোণে পালিয়ে গেলাম—পাছে এই মিলন আর কেউ দেখে। যেখানে দুটো কামিনী গাছে আর জুঁই গাছে জড়াজড়ি করে ফুলে ফুল, রঙে রঙ, গন্ধে গন্ধ মিশিয়ে উষার বাতাসে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তাদেরই আড়ালে বসে কত কথাই না কইতে লাগলাম। কি কথা? নাইবা তা বল্লাম, তাতে তোমাদের কিছু আসবে যাবে না। তবে এইটুকু জানিয়ে রাখি যে, আমরা দুজনে অনেক কথা বল্লাম বটে, কিন্তু আমি যে এখানকার কে কেবল সেই কথাটাই এর কাছে ভাঙ্গলাম না। কেন জান? এইজন্মে, যে আমার তুরিয়ানন্দ যেন আর সেই তুরিয়তে নেই বলে মনে হয়েছিল। তাই ভাঙ্গতে পারলাম না। দেখলাম, আমার পরম মায়াবিনী যেন তাঁর কোমল মায়ায় এই পরম সন্ন্যাসীর মনটাকেও বেশ আচ্ছন্ন করে এনেছেন; যেন এই মহাত্যাগীর বৈশাখী আকাশে আষাঢ়ের প্রথম মেঘ সঞ্চার হয়েছে। আমি তাই সানন্দে বল্লাম, 'দেখলে ভাই, এই রসের দেশে রসের আকাশ বাতাসের মধ্যে এসে পড়ে তোমারও মনটা ভিজে উঠেছে।'

তুরিয়ানন্দ চমকে উঠে বল্লেন, 'তাই নাকি? তা হবে, বিষয়ের সংস্পর্শে এলে বিষয়ের ছাপ পড়বে বৈ কি।' কিন্তু ভাই এইটাই কি তোমার ধারণা হয়েছে যে সন্ন্যাসীর মনটা একেবারে সাহারার মত শুষ্কই? যারা সর্ব্বদা রসের সাগরে ডুবে থাকে তাদের মন বাইরে বজ্রের মত কঠোর মনে হলেও আসলে ফুলের চেয়ে নরমই যে!'

আমি হেসে বল্লাম, 'তাই নাকি! এই মত-পরিবর্ত্তন কবে হ'তে হ'ল? যাক ভাই, আর তর্ক নয়, এখন দুটো নিজের কথা বল শুনি।'

তুরিয়ানন্দ খুব জোরে হেসে উঠ্‌লেন, 'আমার আবার কথা! কোনো কথা নেই ভাই; তার চেয়ে তোমার এই অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কথা আরও বল—আমি তাই শুনি। তুমি এখানে কেন, তাই আবার ভাল করে বুঝিয়ে বল।'

আমি কথা আরম্ভ করেছি, এমন সময় হঠাৎ তুরিয়ানন্দকে উঠে দাঁড়াতে দেখে আমিও চমকে ফিরে চাইলাম। তারপর কি দেখলাম! সেই প্রভাতের সমস্ত জমাট শোভা আমাদের পাশে ফুলের থালা হাতে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সে কি দেখলাম! মানুষ এত সুন্দর! ধন্য আমি যে এই রূপরাশি দেখতে পেলাম! ধন্য আলো! ধন্য বায়ু! ধন্য আকাশ! আর ধন্য সেই ফুলের বনের মধুর গন্ধ! সবাই তাকে ঘিরে ধন্য হল!

মূর্ত্তি ধীরে ধীরে সেই ফুলের থালাটী সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে, নতজানু হয়ে বস্‌ল। তার পর ধীরে ধীরে একটা ফুল নিয়ে সন্ন্যাসীর পায়ে দিয়ে প্রণাম করলে। তার

সন্ন্যাসী ছাড়া জগতে আর কেউ যে থাকতে পারে, তাই যেন তার মনে হয়নি। সন্ন্যাসী কোনো কথা কইলেন না। মূর্ত্তি শেষে উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, 'আপনি এখানে, আমি অনেকক্ষণ আপনার আসনের কাছে অপেক্ষা করছিলাম।'

সমস্ত প্রভাতের আকাশটা যেন গানের সুরের মত বেজে উঠ্‌ল। আমি সেই স্বররাশি দুই কান দিয়ে পান করলাম, উঠে সম্মান দেখাবার সময়ই পেলাম না। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম, যেন সমস্ত জগতের যত রূপ, যত মাধুর্য্য ছিল, যত মন্ত্র-তন্ত্র, যপ-তপ ছিল, সমস্তই ভক্তি হয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে নেমে এসেছে। যেন সন্ন্যাসীর মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত পূজাই আবার দিকে দিকে লোকে লোকে ব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

সন্ন্যাসী বল্লেন, 'এই এঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। ইনি আমার অনেক দিনের বন্ধু।'

উর্ম্মিলাদেবী এইবার চমকে উঠে আমার দিকে চাহিলেন! তারপর ধীরে ধীরে বৃক্ষান্তরালে সরে গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বল্লাম, 'স্বামীজী এখন আমি তবে যাই; এঁরা যে এখন আসবেন তা জানতাম না। আমি এখন তবে—'

তুরিয়ানন্দ ব্যস্ত হয়ে আমার হাত চেপে ধরে বল্লেন, 'না না—তুমি যাবে কেন? উনি উর্ম্মিলা দেবী, ওঁকে সঙ্কোচ করবার কোনো কারণ নেই। আর তুমিও এঁকে দেখে লজ্জিত হয়ো না—ইনি আমারই স্বজন!'

উর্ম্মিলাদেবী এগিয়ে এসে আমাকেও প্রণাম করলেন, একখানি শরৎ-প্রভাতের পথভোলা মেঘ হঠাৎ ভুলে বুঝি আমার কাছে নুয়ে এল, ছুঁয়ে গেল,—বিন্দু বিন্দু বর্ষেও বুঝি গেল!

আমি সেই প্রণামের মধ্যে ঢুকে কোথায় কোন দ্যুলোকের আলোকের মধ্যে হারিয়ে গেলাম।

উর্ম্মিলাদেবী নত বদনে বল্লেন, 'আমি ওঁকে চিনি, উনি আমাদের প্রিয়বাবু ম্যানেজার। আসুন আপনারা, আসন পাতা হয়েছে, এখনি এঁর মা আসবেন, হাসি আসবে, আমার মাও আসবেন।'

আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না, বল্লাম, 'এখন আমি যাই, আর এক সময় আসব। তখন সব কথা হবে।'

সন্ন্যাসী তবু আমার হাত ছাড়লেন না।

উর্ম্মিলাদেবী তখন রাণীর মত গৌরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন, 'সাধুর ইচ্ছার কাছে সংসারের কর্ত্তব্য অনেক ছোটো, আপনার এখন যাওয়া হবে না।'

আঃ বাঁচালে! দেবি, সাধুর ইচ্ছাই হোক, আর যাঁরই ইচ্ছা হোক, তোমার ইচ্ছাই আমার সব। আমার সমস্ত অস্তিত্বই যে এখন তোমার। এই যে এঁর ইচ্ছাকে অবলম্বন করে আমাকে তুমি চাইলে, এই আমার পরম লাভ! তুমি এতদিন পরে তোমার ইচ্ছা আমায় নিজমুখে জানিয়েছ—আমি ধন্য হলাম, কৃতার্থ হলাম! তোমার এই ইচ্ছাটুকুর জন্যই যে আমি এই এতকাল ধরে বেঁচে আছি।

সন্ন্যাসী আমায় ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর আসনেই বসাতে যাচ্ছিলেন, আমি তাড়াতাড়ি মাটীতে বসলাম। তুরিয়ানন্দ বুঝতে পেরে হাসতে হাসতে বল্লেন, 'ভাই, এমনি করেই কি আজ হতে তোমার আমার মধ্যে পার্থক্য রেখে চলতে হবে?'

আমি বল্লাম, 'যার যেখানে স্থান তার পক্ষে সেই স্থানই

শ্রেষ্ঠ। সেই স্থানের অপমান করলে তার নিজেরই অপমান হবে; আমার মাটীতেই স্থান, আমি এই মাটীর অপমান করতে পারব না।'

সন্ন্যাসী নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। উর্ম্মিলাদেবী তাঁর ফুলের সাজি হতে ফুলগুলি তুলে আসনের সামনে সাজিয়ে রেখে দিয়ে, আবার একবার প্রণাম করলেন। তারপর বাইরে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। বুঝলাম আমার উপর তাঁর সঙ্কোচ ভাব দূর হয় নি। তাই এই অবসরে মৃদুস্বরে বল্লাম,—'ভাই, আমি এখন এঁদের চাকর! এঁদের সামনে বেশী সম্মান দেখালে আমাকেও বিপদে ফেলবে এঁদেরও মুস্কিলে ফেলবে। আর একটা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আমার সম্বন্ধে কোনো কথা এঁদের বল না। কেন একথা বলছি তা পরে বলব, এখন নয়। তুমি কেবল এইটুকু অনুরোধ রেখো যে, এই যোগভ্রষ্ট সন্ন্যাসীর কথা বলে আজন্ম-সাধুসেবিকা এঁদের মনে অকারণে আমার ওপর একটা ঘৃণা জন্মিয়ে দিও না। এঁদের চাকরী করি, তবু চাকরের যা সম্মান তা হ'তে এঁরা আমায় বঞ্চিত করেন নি। কিন্তু আমার পূর্ব্বের কথা শুনলে এঁরা হয়ত ঘৃণা করবেন। সে ঘৃণা সহ্য করা কঠিন হবে।'

তুরিয়ানন্দ বল্লেন, 'যোগভ্রষ্ট! কে বল্লে তুমি যোগভ্রষ্ট! তুমি আপন যোগে ত' ঠিকই আছ। তোমার মধ্যে সেই প্রথম দর্শনের সময়ও যে নারীত্বের আভাষ পেয়েছিলাম, তাই ত' এখন পূর্ণত্বের দিকে চলেছে দেখছি। আমার দিকটাই যে একমাত্র যোগের দিক তা যে আর মানতে পারছি না, মনে হচ্ছে তোমার দিকটাও ত হ'তে পারে।'

আমি কথা শেষ করবার জন্য বল্লাম, 'তা যা হয় হোক, এখন তুমি কিছু বলতে পাবে না। আমি চল্লাম। দেখো ভুলনা, এখন আমার বিষয় সম্পূর্ণ নীরব থেকো। আমার এই অনুরোধটী রেখো ভাই, দোহাই।'

আমি চলে এলাম—কিন্তু কেমন যেন হয়ে এলাম। পাগল হয়ে? হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ত্রিবেণীর কথা

১

(সরস্বতী)

হাসির আমার এ কি হল! সে এই মাস-খানেকের মধ্যে এমন হয়ে গেল কেন? মা ভাবছেন, দিদিমা কাঁদছেন, এমন কি বোধ হচ্ছে যেন বাড়ীশুদ্ধ সবাই ভাবছে যে, এই সারা গ্রামখানার হাসিখানি এমন হয়ে একটা ছোট্ট ঘরের কোণে মিলিয়ে যাচ্ছে কেন? এমন কি এই হত-ভাগিনী বাকশক্তিহীন মানুষটাও যেন মুক দৃষ্টিতে জানাচ্ছে যে, তার করুণাময়ী হঠাৎ তার প্রতি এমন অকরুণ হয়ে উঠল কেন? কেবল ঘরের কোণে বসে একটা ছবি নিয়েই ভাবছে, না হয় তুলি বুলুচ্ছে, না হয় হাঁ করে তার দিকে চেয়ে আছে।

ছবিখানাও দেখিছি—একটী ভিখারীর মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে কত ফুল, কত শোভা, কত হীরে মাণিকের রাশি হেলা ফেলা করে সাজান। কিন্তু তার মাঝখানে গৈরিক বসনে ভিক্ষাপাত্র হাতে একজন ভিখিরী। এ যেন সেই তার পূর্ব্বের আঁকা বুদ্ধদেবের ছবিখানার নতুন সংস্করণ। সেই বুদ্ধের ছবিখানা কোথায় সরিয়ে ফেলেছে, আর দেখতে পাই নে। কিন্তু তার স্থানে এ কার মূর্ত্তি সে আঁকছে। এ মুখখানার সঙ্গে যাঁর সাদৃশ্য রয়েছে তাঁকে এমন সন্ন্যাসীর বেশে সাজিয়ে দেবার কি কারণ যে আছে তাওত' খুঁজে পাই নি। প্রিয় বাবুর চেহারার মধ্যে

কোন স্থানেও ত' সন্ন্যাসীর লক্ষণ আমি দেখতে পাই নি। তবে আমি তাঁকে অধিকাংশ সময় দূর হ'তে, না হয়, আড়াল থেকে দেখিছি, তাই জোর করে বলতে পারি নে বটে, কিন্তু কৈ আর কাউকেও ত' এ রকমের কোনো কথা বলতে শুনিনি। তবে শুনিছি বটে ইনি খুব জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, বিদ্বান লোক। তাই বলে এঁর মধ্যে সন্ন্যাসীর ভাব কি করে হাসি দেখলে ?

প্রিয়ব্রত বাবু যে খুব ভাল লোক তা'ত সবারই মুখে শুনছি। শুনছি তিনি আসাতে গ্রামের শ্রী ফিরে গেছে। সারা দেশের লোক এঁর প্রশংসা করছে—সমস্ত গ্রামের হেন কাজ নেই যাতে নাকি এঁর হাত নেই। গ্রামের দুঃখী দরিদ্ররাও নাকি বেশ দু'পয়সা রোজগার করে এঁর সাহায্যে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় করে নিচ্ছে। তবু কেউ ত' বলেনা যে ইনি সন্ন্যাসী। মা বলেন বটে, যে, ম্যানেজার বাবু খুব ধার্ম্মিক, শুদ্ধাচারী, স্বল্পভাষী, স্বল্পব্যয়ী মানুষ। বিষয়বুদ্ধিও শুনেছি তাঁর যথেষ্ট আছে—বিষয়ের আয়ও বেড়েছে। কিন্তু কেউ ত তাঁকে কৈ সন্ন্যাসী বলে না, বা সন্ন্যাসী বলে ভুল করে না ? তবে সেই বিষয়ী মানুষটীর মধ্যে এই অদ্ভুত মেয়ে মানুষটী সন্ন্যাসীকে কোথায় দেখতে পেলে ?

সন্ন্যাসী ? সন্ন্যাসী—দেখেছিলাম কেবল সেই এক দিন, আর দেখছি, এই এতকাল পরে আমার ঘরের দ্বারেরই কাছে। জানি না আমার কি সৌভাগ্য যে আমারই কাছে, সেই কত দিনের হারানো চাঁদ আবার আমারই আকাশে দয়া করে উদয় হয়েছেন, দয়া করে ধরা দিতে এসেছেন।

ধরা দিতে ? হায় রে মেয়ে মানুষের প্রাণ! এ কথা কেমন করে, কোন্ সাহসে তুই বল্লি ? কৈ তিনি ধরা দিলেন ? সেই

যেমন প্রথম ধরা দিতে এসে ধরা না দিয়ে সরে গিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি করেই ত' আজও কাছে এসে ধরা নিয়ে আত্মস্থ হয়ে বসে আছেন। এখন যে ইনি আরও দূরে—বহু দূরে—কোন সপ্তর্ষি লোকের ধ্রুবতারার মধ্যে লীন হয়ে আছেন। আমার যোগী যে ধ্রুবলোক হতে নামতেই পারেন না। না—না—নেমে কাজ নেই। তুমি অমনি ধ্রুবলোকেই থাক, আমিও এই অধ্রুবের জগৎ হতে তোমার ঐ দু'টী বিশাল কোমল নয়নের মধ্য দিয়ে আমার ধ্রুব ভক্তিকে সেই লোকে পাঠিয়ে দিই।

কিন্তু হাসিই বা এ কি করে বসল? হাসি এ কোন্ অপরিচিতকে এনে আমাদের দুই বোনের মাঝখানে দাঁড় করালে? এঁকে কে চায়? আমি? কৈ একদিনও ত' এঁর শুভাশুভ কোন কর্ম্মের দিকে ফিরে চাইবার কোনো অবসর পাই নি? তবে কেন আমার এত কাছে, আমার হাসির হাসিটুকুর অন্তরে এঁর স্থান হল? হাসি এ কি করে বসল?

তাকে মানা করবার জো নেই। মানা করলে বলে, 'আমার বাবা ক্রিশ্চান হয়ে বেরিয়ে গেছেন, কিন্তু আমি ঘরে থেকেই ক্রিশ্চান। আমি তোমাদের এই সব বাজে লোকাচার মানি নে।' সে বাস্তবিকই কোনো দিন কোন মিথ্যে সংকোচ রাখে নি, যখন যেখানে যাবার দরকার বোধ করেছে সেখানে গিয়েছে, যে কাজ করবার দরকার বোধ করেছে তাই সে করেছে। কেউ তাকে বাধা দেয় নি, দিতে পারে নি। সে তার হাসির জোরে সমস্ত বাধাই উড়িয়ে দিয়েছে। আজ তাকে কে ঠেকাবে? আমি? আমার সে সময় কৈ? ইচ্ছে কৈ? শক্তি কৈ? আমার সমস্ত শক্তিই যে এক জায়গায় আটকে গিয়ে শিবের জটায়

গঙ্গার মত পাক খাচ্ছে। কোন্ ভগীরথ তাকে আরাধনা করে নামিয়ে আন্‌বে ?

* * * *

আজ প্রভাতে আমার সন্ন্যাসীর পাশে এ কাকে দেখে এলাম। এ কে—এ কে—এ কে গো! একে দেখলাম, যেন আমার হোমাগ্নির পাশে শান্তিজলের কলসের মত চুপ করে শেষের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন! কে ইনি, যাঁকে আমার সন্ন্যাসী এত আগ্রহে নিজের বুকের মধ্যেই টেনে নিচ্ছিলেন? কে তুমি এত দিন আপনাকে এমন ভাবে গোপন করে রেখেছ? তোমায় ত' চিনতে পারলাম না। তুমি আমাদের দাসত্ব করতে এসেছ, কিন্তু তোমার ঐ দাস ভাবের আবরণের মধ্যে যে মহাপ্রভুত্বের আভাস হঠাৎ বিদ্যুতের মত ঝলক মারলে, তা কি সত্য ?—না তাও একটা মিথ্যা আলেয়ার আলো? যদি আলেয়া হয় তা হলে অভাগিনী হাসি মরেছে, আর যদি আলেয়া না হয়ে ধ্রুব জ্যোতিঃ হয় তা হলে? তা হলেও না জানি তার কি হবে?

যা ভয় করছি, যদি তাই হয় তা হলেও ত তুমি সহজ-লভ্য নও। হে অপরিচিত, হে আবৃত জ্যোতিঃ, তোমার সত্য মূর্ত্তি প্রকাশ ক'র, নইলে যে আমরা ভয়ে মরি। নইলে অভাগিনী হাসির হাসি যে আর দেখতে পাব না।

* * * *

কথা কও—কথা কও! আজ আমার শুধু কথা শুনবার ইচ্ছে করছে—কথা কও! হে চিরমৌন, আর কত কাল এমনি ভাবে শুধু একটী কথার আশায় বসিয়ে রাখবে, কথা কও! এত কথার জগতে, এত কোলাহলের হাটে, শুধু সেই একটী

কথাই কি কেবল শুনতে পাব না,—আর সবই শুনতে পাব? আর সবই শুনতে পাব, কেবল সে একটী কথা হ'তে তুমি আমায় বঞ্চিত রাখবে? প্রভাত হ'তে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা হ'তে প্রভাত—এমনি করে কত রাত্রি, কত দিন কেটে গেল, কত কথা তুমি কইলে, কেবল সেই একটী কথা হ'তেই বঞ্চিত রাখলে! বঞ্চিত রাখবে বলেই কি আগে হ'তে এই বাক্যহারা মেয়েটীকে আমাদের মাঝে রেখেছ দিয়েছ? তাই সেই প্রথম দিনই, তোমার চিরমৌন ভাষার প্রতিনিধি করে, এই যাকে পাঠিয়েছ তাকে বুঝি কথা কহাতে পারলাম না?

কিন্তু আমিও ছাড়ব না, আমি একেও কথা কহাব। একেও একদিন তোমার সামনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেখাব যে, আমি কথা কহাতে জানি, মৌনতার মধ্যে মুখরতার জন্ম দিতে পারি, চির স্তব্ধ আকাশেও ধ্বনি জাগাতে পারি। ব্যথা—আমার কথা কইবে এবং সেই সঙ্গে তুমিও কইবে—নিশ্চয়ই কইবে। যে কথার জন্য আমি আমার জন্ম হ'তে প্রতীক্ষা করে আছি, যে কথার জন্য আমার জনক ঋষি সারা জীবন অপেক্ষা করে গেছেন, সে কথা যে চির দিন অকথিত থাকবে এ হ'তেই পারে না। তাঁর সাধনা ব্যর্থ হ'তে পারে না—তাঁরই আশা আমার মধ্যে জ্বলন্ত হয়ে জেগে আছে। সেই অমর আত্মার অমর আশা অমর সাফল্যকে টেনে আনবেই। আমি তার সূচনা দেখতে পেয়েছি।

* * * *

আমার 'ব্যথা' আমার হাসির ব্যথা, এই মুখর সংসারের মৌন মূক 'ব্যথ'াও যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। যেন তার মৌনতার মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি জেগে উঠেছে। কেন উঠেছে

তাও ধরতে পেরিছি ; কারণ, তার হাসি আর তাকে তেমন করে প্রাণভরা হাসি দিয়ে বাঁচিয়ে তুলছে না। কিন্তু তার চোখে এত দিন পরে জল দেখতে আরম্ভ করিছি—সে কেঁদেছে। আমি তাকে ভাষা শেখাবার বিফল চেষ্টায় যতই ব্যস্ত হয়ে উঠেছি, সে ততই মৌন অশ্রুভরা চোখে তার হাসির হাসির জন্য মিনতি জানাতে আরম্ভ করেছে। যদি এই মৌন ভাষা স্ফুট হয়—এই এত দিনকার চেষ্টার ফল দেখা দেয়, যদি সে হঠাৎ তার স্ফুট ভাষা খুঁজে পায়, তা হলে কি, সে যার মৌনতার প্রতিনিধি, সে কথা কইবে না ?

*　　　*　　　*　　　*

কিন্তু তুমি ত' কথা কইতে পার, তোমার বন্ধুর কাছে ত' দূর হ'তে দেখলাম কত কথাই না কইছ! কেবল আমিই বঞ্চিত থাকব ? আমার কাছে কি কেবল শুষ্ক উজ্জ্বল তত্ত্বকথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলবার নেই তোমার ? যে কথা বলবার জন্য তোমার সমস্ত দেহ মন আত্মা ছট ফট করছে—হ্যাঁ করছে, নিশ্চয় করছে—সেই কথাটাই কেবল বাদ থেকে যাবে ? তুমি কি মনে করেছ আমার কেবল কান দুটোই আছে, চোখ নেই, মন নেই, আর কোনো কিছুই নেই ? আমি যে তোমার কতখানি দেখে নিয়েছি, তাই যে তুমি ধরতে পারছ না। তোমার যোগযুক্ত মন যেখানেই যুক্ত থাক, তোমার মনের মন যে কোথায় ধীরে ধীরে যুক্ত হচ্চে তা যে তোমার চোখে পড়ছে না, এইটেই আশ্চর্য্য !

*　　　*　　　*　　　*

কিন্তু আমার যোগীর এই ভোগী বন্ধুটিকে কেমন যেন একটু

ভয় ভয় করছে। কি যে কথা হয় এঁদের মধ্যে তা যে কোন দিন সাহস করে আড়াল থেকে শুনতে পারলাম না! আড়াল থেকে শোনা! ছি ছি, তা কেমন করে পারব? তা যেদিন পারব সেদিন কি আর আমার সন্ন্যাসীর কাছে আমার চির-প্রার্থিত রঘুনাথজীর কাছে যেতে পারব? না—না—না, তা পাবর না। যদি চিরদিন এই দু'জনের পরিচয় গোপনই থাকে, তবু তা পারব না।

কিন্তু এক একদিন ইচ্ছা হয় প্রিয়ব্রত বাবুর মার কাছ থেকে, আর যদি সম্ভব হয় অবিনাশ বাবু উকিলের কাছ থেকে এঁর পরিচয় নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু পারি না যে। কে যেন বাধা দেয়। তাই হাসির কাছেও এ কথা পাড়তে পারি না। লজ্জা করে—। লজ্জা! আমার আবার এ উৎপাত কোথা হতে জুটল! যে কোন দিন কোন লজ্জা ভয়ের ধার ধারেনি, তার আবার লজ্জা!

কিন্তু তবু সেই লজ্জাও ত' আমার মধ্যে লুকিয়ে বসেছিল। এতদিনকার অব্যবহারেও ত' সে মরে নি।

বুঝি কিছুই মরে না; এই অমরতার জগতে কিছুই মরে না। কালে সবই ফুটে ওঠে, সময় হলে সবই আবার ফুলে পাতায় সজীব হয়ে ওঠে। ওরে মন! ভয় নেই, সময়ের অপেক্ষা কর্ তোর সাধনাও সফল হবে।

২

(যমুনা

হ্যাঁ—ভারী চালাকী, না ?—জগৎশুদ্ধ লোকের বুদ্ধি আছে কেবল আমারই নেই—না ? আমি মোটে হাসি, আর সবাই দেব দেবী, ঋষি মহর্ষি ছাই ভস্ম কত কি! আমার সঙ্গে কথা কইবার সময় কারুরই সমিহ করার দরকার নেই, লজ্জা করার দরকার নেই, যা ইচ্ছে বল্লেই হ'ল, যেমন করে ইচ্ছে হুকুম করলেই হল। আর আমি হইছি খেঁকী কুকুর, কাজও নেই অবসরও নেই। কেবল তু করে ডাকলেই ছুটে যাব। 'এঁর খোজ নাও', 'ঐ কাজটা করবার জন্য হুকুম নিয়ে এস', 'এই ব্যাপারে যাতে এষ্টেট থেকে টাকা বেরোয় তার জন্য দয়া করে বল'—আমি বুঝি তোমার আর সংসারের মধ্যেকার টেলিগ্রাফের তার ? না আমি তা নই।

কেন তা হব ? আমি চিরদিন স্বাধীন, কেন আমি তোমার ছল-ভরা হুকুম মেনে চল্‌ব ? দেখাও, যেন কতই পরের হুকুমে চলছ, পরের দরকারে খাটছ, কিন্তু আমি তোমার মুখের কাপড় উঠিয়ে দেখে নিয়েছি—তা তুমি যতই তোমার ফটোই গোপন কর, আর যতই চাপকান চোগা লাগিয়ে আর্দ্দালি সেজে বেড়াও। আমি তোমায় চিনিছি মশায় চিনিছি। ও সব চালাকী আর যার কাছে হয় কর গিয়ে, আমার কাছে ওসব চলবে না।

আমি ত' আর কোনো রকম চশমা চোখে দিয়ে বসে নেই, যে, কাছে কিছুই দেখতে পাব না, শুধু দূরের দিকে চেয়ে দূর দেখবার আশায় বসে থাকব—আর নিকটের যা কিছু সব হাত ফসকে পালিয়ে যাবে ? ও গো মশায় তা হবে না—আমার কাছে তা হবে না। আমি ধর্ম্ম মানিনে, কর্ম্ম মানিনে, শাস্ত্র মানিনে, মন্ত্র মানিনে। আমি শুধু মানি এই আমার বাইরের চোখ দুটোকে

আর আমার অন্তরের চোখকে। এই তিনটেতে যা ধরা পড়বে তাই আমার কাছে সত্য, বাদ-বাকী সমস্তই মিথ্যে মায়া ভোজবাজী।

ঐ যে দিদির সন্ন্যাসী ম'শায় আজ কতদিন হতে নাসাগ্র—বদ্ধদৃষ্টি হয়ে বসে আছেন, মনে করছেন যে ওঁর ঐ চোখ দুটো যে মাঝে মাঝে ইদিক-উদিক নড়ছে, এ বুঝি কেউ দেখতে পায়নি! হায় রে বোকা মানুষগুলো! বিশেষতঃ ঐ সব একাগ্র মানুষগুলো! ওরা যতই একাগ্র ততই যে বোকা—ততই যে স্বচ্ছ, এটা ওরাই সবচেয়ে কম জানে। ঐ যে আমার দিদিটী, যিনি মনে করেছিলেন যে পরীক্ষা না করে কাউকে তিনি তাঁর অন্তরের মধ্যে, বিশ্বাসের মধ্যে স্থান দেবেন না, তিনি যে আজ একাগ্র বিশ্বাসে ঐ সন্ন্যাসীকেই আশ্রয় করেছেন, এটাই ওঁর চোখে পড়ছে না। এমনি অন্ধ এই সব যোগী মানুষগুলো!

কিন্তু সবারই যোগ ভাঙ্ছে! আমি দেখতে পাচ্ছি ধীরে ধীরে সবাই বিয়োগের মধ্যে দিয়ে গুণে পৌছচ্ছেন; এবং শেষে ভাগে পৌঁছে আপনাকে খণ্ড খণ্ড করে বিলিয়ে দিতে পথ পাবেন না, এও আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি।

আর তুমি!—তুমি যে কেঁচে গণ্ডূস্ করতে এসেছ? তুমি মনে করেছ যে তোমার অন্তরের সন্ন্যাসীটা বুঝি তোমায় ছেড়েছে—তোমার বৈরাগ্যের ভূত বুঝি তোমার ঘাড় থেকে নেমেছে? নামেনি মশায় নামেনি—

কিন্তু সেইটেই ত' দুঃখ! কেন সে ভূত ছাড়ছে না তোমায়? কি চাও তুমি? কাকে চাও তুমি? কি মহা সত্য তোমার কাছে এখনো অপ্রকাশিত আছে? ওগো, তোমার মনের ঝুলির মধ্যে এখনো কোন মহাভিক্ষা এই অন্নপূর্ণার সংসার দেয় নি,

যার লোভে তুমি তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম, যাগ-যজ্ঞ, কৃচ্ছ-বৈরাগ্য সব ছেড়ে দাসত্বের মিথ্যাকে অবলম্বন করছে ? সে কথা কি বলবে না—কখনো বলবে না, কাউকে বলবে না ?

কিন্তু না বললেও ত' আমি ছাড়ব না। আমিও তোমারই চার পাশে ভ্রমরের মত ঘুরব, দেখি তোমার মুদিত মন-পদ্মের গোপন মধুটুকু চুরী করিতে পারি কিনা। আমিও ছাড়ব না, এমনি করে আমার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার মনের দ্বারে আঘাত ক'রব। দেখি সে দুয়ার কতদিন বন্ধ থাকে।

* * * *

ব্যথাকে দেখিনে বলে, পিসীমা আমায় বকছিলেন। কিন্তু ব্যথাকে নিয়ে দিদিত' দেখছি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তা হলে আর আমার দরকার কি ? সংসারের কাজ ? সেও ত' বেশ চলছে, কৈ কারুর পাতে কিছু পড়ে নষ্টও হচ্চে নাত'—আর কেউ কিছু পেলেনা বলে কান্নাকাটীও ত' করছে না ? যে সত্যসত্যই কান্নাকাটী করছে, সে যদি তার এই ছাব্বিশ বছরের একটানা দুর্ভিক্ষ দুদিনের জন্যে মেটাবার চেষ্টা করে, তা হলেই এত কথা উঠবে ? সংসারের এ কেমন বিচার !

না, আমি এতদিন ধরে পেরেছি—আর যদি না পারি ? তাতে তোমাদের এত কলরব কেন উঠবে ? পাঁচজন কাণাকানি করছে ? করুক গে, কবে সে কাণাকানিতে তোমরা কাণ দিয়েছ ? তোমরা যে এই সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত একটা সংসার গড়ে তুলেছ, এই যে তোমাদের ভারতছাড়া, এই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-ছাড়া বাড়ীটাকে, এই মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের দেশের বুকের ওপর প্রতিষ্ঠা করেছ, এর জন্য কার মুখের দিকে তোমরা চেয়েছ ? কবে চেয়েছ ?

কখন না।—তবে এই বাড়ীরই একজন হয়ে আমিই বা কার মুখ চেয়ে নিজেকে নিয়মের মধ্যে বেঁধে রাখব ?

না—তোমরা যখন কোনো নিয়ম মান নি, তখন আমিই বা মানব কেন ? তোমরা যখন একটা ছায়ার পেছনে ছুটছ, তখন আমিই বা ছুটব না কেন ?

ছায়া ! মিথ্যে ! মরীচিকা ! হোক মরীচিকা, তবু আমি যাব। সেই দিকেই যাব।

মিথ্যে নয় এ সংসারে কোন্‌টা ? সারা সংসারই যে মায়ার পেছনে ছুটছে ! আমিই কেবল চুপ করে থাকব ? এ কেমন বিচার তোমাদের ?

মিথ্যে নয় গো ম'শায়রা মিথ্যে নয়। এ যদি মিথ্যে হয়, তা হলে গাছে ফুল ফোটাও মিথ্যে, আকাশে চাঁদ ওঠাও মিথ্যে, প্রভাতে সূর্য্য ওঠাও মিথ্যে, জগতের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ সবই মিথ্যে।

মনে মনে সবাই জানে—কিছুই মিথ্যে নয়, তবু জোর করে বলবে মিথ্যে—মায়া—ভেল্কি—ভোজবাজী। এই মিথ্যের ধুয়োটাকে কোন্ মিথ্যেবাদী জগতে এনেছিল ? তাকে যদি হাতের গোড়ায় পেতাম তা হলে তার মাথাটা ধরে দেয়ালে ঠুকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, এই মিথ্যের আঘাতটা কেমন লাগছে ?

* * * *

কিন্তু তোমার আবার এ কি নূতন হুজুগ উঠল ? তুমিও আবার কাজকর্ম্ম ফেলে, মাঝে মাঝে ঐ মিথ্যের রাজা সন্ন্যাসীজীটীর কাছে ধন্না দিতে আরম্ভ করলে কেন ? আমার যে ভয় করছে।

ভয় ? হ্যাঁ ভয় বৈ কি। নিজের কাছে গোপন করে দরকার কি ?—হ্যাঁ আমার ভয় করছে। তুমি অমন করে আজ

আমার ঐ বুদ্ধদেবের ছবিখানার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলে কেন? কি দেখছিলে ঐ অপটু হাতের অসম্পূর্ণ শিল্পটার মধ্যে? তোমার ঐ অমন সুন্দর উজ্জ্বল চোখদুটো আজ অমন মরার মত আমার দিকে চাইলে কেন? আজ কেন কোনো আদেশ আমি পেলাম না? কেন আজ তোমার কথার মধ্যে তোমাকে পেলাম না! কোন্ দূর বন-বনান্তরে তুমি আজ মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে? তোমায় যে আজ কিছুতেই সেখান থেকে তুলে আনতে পারলাম না? কেন পারলাম না? কি আমাতে আজ ছিল না? কোন্ বস্তুর অভাবে আজ তোমায় আমার দিকে ফেরাতে পারলাম না? কি নেই আমাতে? তুমি যদি অমনি করে মুখ ফেরাও তা হলে সমস্ত জগৎ যে মুখ ফেরাবে—তা হলে কি নিয়ে থাকব? আমি যে এখন সব হারিয়ে বসে আছি। শুধু একটী আশায় আমি যে সব আশা ত্যাগ করেছি! এখন যদি মুখ ফেরাও— উঃ! না, তা যে ভাবতেও পারি নে!

* * * *

আমি ত' আশা করাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। দিদি যেদিন সব ছেড়ে আশাকেই আশ্রয় করলে, সেইদিন হ'তে আমি সব ধরে আশাকের ছেড়েছিলাম, কিন্তু তুমিই ত আশাকে জাগিয়ে দিয়েছ প্রভু! অগো আমার না-চেয়ে পাওয়া ধন, ওগো আমার অকালের মেঘ, আজ যদি তুমি আবার আকাশে মিলিয়ে যাও, তাহ'লে কি করে বাঁচব? না—না—তা পারব না, আমি তা পারব না। তোমায় ফিরতেই হবে। তুমি যখন এসেছ, যখন এ জীবনাকাশে আপনি এসে উদয় হয়েছ, তখন তুমি আমারই। তোমায় আর আমি মিলিয়ে যেতে দেব না, কিছুতেই নয়। আমার

যা কিছু আছে সব দিয়ে তোমায় আমার আকাশে বেঁধে রাখব। একবিন্দু জলও যদি ঐ মেঘ হ'তে না পড়ে, যদি ক্রমাগত বিদ্যুৎ আর গর্জ্জনই শুনতে হয়, যদি বজ্রাঘাতও নেমে আসে, তবু এ মেঘ আর মিলুতে পাবে না। এ মেঘকে আমি আমার সমস্ত কেকা দিয়ে সমস্ত কলাপের বিস্তার করে, সমস্ত কদম্ব ফুটিয়ে ধরে রাখবই রাখব।

* * * *

কিন্তু এত যে জোর করে কাল ঐ কথাগুলো লিখিছি এ জোর আমার থাকছে কৈ? মনে হচ্ছে যেন কোন অজানা দিক্ হতে কেমনধারা যেন হাওয়া বইছে। আমার মেঘমালাও যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার নয়নে যে গভীর ছায়া দেখে এলাম, এ ছায়া কিসের? কার এ ছায়া? এ ছায়া কোথায় ছিল এতদিন?

কি জানি কোথায় ছিল!—কিন্তু ছায়া যে জেগে উঠেছে, বাতাস যে লেগেছে আমার মেঘে! কোন্ দিগন্ত হ'তে অজানা আলো এসে আমার মেয়েকে রাঙিয়ে তুলছে, দুলিয়ে তুলছে? ফুলিয়ে তুলছে? কিন্তু বর্ষণ হবে কোন্ দিকে? কোন্ উষর দেশে, কোন্ মরু-প্রান্তরে? কদম বনের ঘনপাতার ওপরে, না শুকনো নদীর বালুর চরে? কোথায় এ মেঘ সরে চল্ল!

মন যে আমার কেঁপে উঠ্ছে—দূরে কি আবার চাতক ডাকছে নাকি? কোথয় গেল আমার কেকা, কোথায় আমার কলাপ! আনো—আনো—সব আন—বাদ্য আন, নৃত্য আন, আন গান, আন ফুল, আন হাসি, আন বাঁশী যা কিছু আছে সব নিয়ে এস—মেঘকে আমার বাঁধতেই হবে।

৩

(গঙ্গা)

তুরিয়ানন্দ! বন্ধু! এখন? হার স্বীকার করছ কিনা? হারতে হল কিনা? সেই সর্ব্বশক্তিময়ীর কাছে জোরাজোরী।— তার কাছে চালাকী!

কিন্তু ভয় নেই ভাই, এতে তোমার জয়ই হবে, তুমি হেরেও হারবে না। ঐ মায়াবিনীর এমনি মায়া, যে, যে হারে, তার কাছে সেও অমনি হার স্বীকার করে। যে হারতে চায় না, সেই মরে। তুমি এতে মরবে না ভাই, আনন্দময়ী তোমার সৎচিৎ—একের মধ্যে একেশ্বরী হয়ে ধরা দেবেন; তোমার একত্বও বাঁচবে সর্ব্বত্ব বাঁচবে।

আমিও ধন্য হলাম, তোমার মধ্যে এই অপরূপা যাকে পাচ্ছেন সেই আমিও ধন্য হলাম, পূর্ণ হলাম মুক্ত হলাম। আমি বেঁচে গেলাম, ভাই, বেঁচে গেলাম, তোমার মধ্য দিয়ে এই আমার সাধনার ধনকে বুকে পেয়ে ধন্য হলাম। তোমার মধ্য দিয়ে এর অন্তরে প্রবেশ করে এর সংস্পর্শ লাভ করে সেই পরম মায়াবিনীর চির অধরের ধরা ছোঁয়া পেলাম। তোমার পায়ে কোটী কোটী প্রণাম—আমার চির সাধনার সিদ্ধি এসেছে আর দেরী নেই সমস্ত দিগন্ত ঘিরে সেই মহাসম্ভাবনা জেগেছে। আর ভয় নেই। আর দ্বিধা নেই, সত্যোলপব্ধির জোরে বলছি, নিজে আমি আমার কাছে যেমন সত্য তেমনি সত্যভাবে অনুভব করিছি যে তোমার মাঝেও আমি তেমনি সত্য—আবার তোমার

আমার সবারই মাঝে সে—সেই আমার একটী মাত্র যে সেও সত্য। সে আজ এই ছোটো দুটো চোখে সাড়েতিন হাতের বেশী নয় তবু তার ঐটুকুত্বের মধ্যে সব দেখিছি, সব পেয়েছি, সব হয়েছি।

এখন স্বীকার কর বন্ধু আমার দেখা মিথ্যের দেখা নয় মায়ার দেখা নয় ভুলের দেখা নয়।

* * * *

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

আজ সব শেষ হয়ে গিয়েছে। সর্ব্ব দ্বিধা সর্ব্ব দ্বন্দ্ব মিটে গেল—পরম বিজয়িনীর সর্ব্বপ্রকারেই জয় হয়েছে। অসাধনায় তারই জয়, সাধনাতেও তারই জয়; অসহজেও তারই জয়, সহজেও তারই জয়; জ্ঞানেও তারই জয়, অজ্ঞানেও তারই জয় হয়েছে। সেই কথা বলে আমার এই কথার জালের শেষ গ্রন্থি শেষ করে দি—

আজ সকাল থেকে কোনো কাজে মন দিতে পারি নি। কেন? যেদিন এমন একটা ঘটনা ঘট্‌বে সেদিন কি আর চুপ করে অন্য-কাজে থাকবার জো থাকে? তাই আজ সকালেই উঠে চুপ করে বসেছিলাম! সমস্ত প্রভাতের আলোটা যেন কেমন জমাট হয়ে আমার চোখ দুটোর সামনে, ঠিক যেন ভুরু দুটোর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে আসছিল। ঠিক সেই সময় আমার কুড়িয়ে পাওয়া সহজে পাওয়ার ধন হাসি এসে উপস্থিত। অমনি আমার ভ্রূমধ্যগত আলো আবার সারা জগতে ছড়িয়ে পড়ল। আমি তার দিকে ফিরে বসলাম।

হেসে উঠে সে বল্লে, "আর মিছি মিছি আমার মান্য রাখতে ফিরে বসবেন না। যা করেছিলেন করুন।"

আমিও হেসে বল্লাম, "কি করছিলাম?" সে বল্লে "না-ভাবা ভাবছিলাম।"

আমি বল্লাম, "না-ভাবা? সে আবার কি? তাই নাকি আবার ভাবা যায়?"

সে বল্লে, "আপনাদেরত সব যত অনাসৃষ্টি যত অপরূপ যত অসম্ভব নিয়েই কারবার; তাই আমি আপনাদের চিন্তার নাম রেখেছি না-ভাবা ভাবা।"

আমি একটু নড়ে চড়ে উঠে বসলাম, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। না জানি এই সেই পরম মায়াবিনীর অখণ্ড কণাটী কিই বা বলে বসে!

কিন্তু সে আমাকে কথা শুনতে উৎসুক দেখেও কি জানি কি ভেবে দূরে সরে গিয়ে, তারই আঁকা সেই যোগীচক্রবর্ত্তি বুদ্ধদেবের চেহারাটার সামনে দাঁড়াল। আমি চেয়ে চেয়ে বল্লাম "না-ভাবাটা কি রকম আমায় বোঝও না হাসি?"

অসামান্য ঘটনা অনেক সময় অত্যন্ত সামান্য কারণ থেকেই ঘটে—আমার এই সামান্য একটু পরিহাসের কথা হতে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল যার জন্য আমি—অন্ততঃ সেই মুহূর্ত্তে—প্রস্তুত ছিলাম না। হাসি আমার দিকে একবার ফিরে চেয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে কাঠের মত হয়ে সেই ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে রহিল। আমিও তখন আমার আসন ছেড়ে উঠে ধীরে ধীরে সেই ছবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপর ছবিটার দিকে চেয়ে বল্লাম,—

"তুমিও কি না-ভাবা ভাবছ নাকি? কিন্তু বুদ্ধদেবত—" আমার কথা শেষ হল না, কারণ হঠাৎ চেয়ে দেখি আমার সেই চিরহাস্যময়ীর হাসি কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে। তার পরিবর্ত্তে

বজ্র বিদ্যুৎের একটা ভয়ঙ্কর মেঘ সমস্ত মুখখানায় ছেয়ে এসেছে। আমি ভয়ে পেছিয়ে গিয়ে বল্লাম, 'কি হয়েছে হাসি ?' হাসি আমার দিকে পূর্ণভাবে ফিরে বল্লে, 'আমায় নিয়ে প্রতিদিন এমন ভাবে খেলা করবার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে ?'

আমি ভীতভাবে বল্লাম, 'আর কেউত দেয়নি, তুমি নিজেই দিয়েছ। তুমিই সহজ ভাবে সরলভাবে ব্যবহার করে আমার সাহস বাড়িয়া দিয়েছে। তাই সময় অসময় তোমার সঙ্গে খেলা করে—"

"না না, আমায় নিয়ে খেলা করবার আপনার কোনো অধিকার নেই। কে আপনি যে আমায় নিয়ে রাতদিন পুতুল-খেলা করবেন ? আপনি সন্ন্যাসী আপনার দয়া নেই মায়া নেই ; আপনার ভুল হয় না আপনি সত্যকে ধরে সহস্র মিথ্যার মধ্যে অচল হয়ে বসে আছেন। কিন্তু আপনার পক্ষে যা খেলা তা অন্যের পক্ষে খেলা নাও হতে পারে, এ ধারণা কি কখনো আপনার হয়েছে ? হয়নি—যদি হ'ত, তা হ'লে প্রতিদিন—উঃ যদি সত্যিই অন্তরে অন্তরে সন্ন্যাসীই থাকবেন তবে কেন আমাদের কাছে এসেছেন ? কে আপনাকে এই নিষ্ঠুর খেলা খেলতে ডেকেছিল ? কে আপনাকে—"

আমি তাকে বাধা দিয়ে বল্লাম, "কে ডেকেছে তা বলতে পারি কিন্তু তা কি কেউ বিশ্বাস করবে ? কেউ না। কিন্তু যেই ডাকুক তার ডাকের ঝড়ে আমার সন্ন্যাসীগিরির ছাই মাটী ঝুলি ঝাম্পা সব উড়ে গেছে। তোমার কাছে সব বলতে পারতাম, কিন্তু দেখছি তুমিও বিশ্বাস করবে না—প্রথম হতেই বোধ হয় একটা অবিশ্বাসকে মনে স্থান দিয়েছ, তাই মূর্ত্তিমতী-হাসির মুখ থেকে আজ এইরকম বেদনার কথা, আনন্দহীন ব্যথা দেবার কথা বেরুচ্ছে।"

আমার কাতর স্বরে হঠাৎ দেখি হাসির মুখের সমস্ত জমাট মেঘ অশ্রুতে গলে গেল। সে দুই হাতে মুখ ঢেকে বসেপড়ে বল্লে "আমি বিশ্বাস করব, আমায় বল।"

'বিশ্বাস করবে তুমি! বুঝবে তুমি আমাকে! আঃ বাঁচলাম হাসি।" হাসি আবার বল্লে বিশ্বাস করবে। আমি তার স্বর শুনে বুঝলাম সে বিশ্বাস করবে। অমনি চিরদিনের সমস্ত সাধনা যেন সিদ্ধি লাভের পরমানন্দে আমার মধ্যে নেচে উঠল। আমার সমস্ত অতীত ভবিষ্যৎ একটী মাত্র বর্ত্তমানে সত্য হয়ে উঠল। এইত আমার সহজের ধন এইত আমার চিরকালের পাওয়ার ধন! একে চাইতে হয় না চাইলে একে পাওয়া যায় না। তাই একে পেয়ে আমার জন্ম জন্মান্তরের, লোক লোকান্তরের অস্তিত্ব সেই এক মুহূর্ত্তের অস্তিত্বে এসে জমাট বেঁধে দাঁড়াল। সমস্ত রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ—জগতের যা কিছু আছে বা ছিল সবই যেন এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সত্য করে পেলাম। ঐ একটি প্রাণের এক মুহূর্ত্তের বিশ্বাসে আমি বাঁচলাম—ওগো বাঁচলাম।

আমি ধীরে ধীরে বল্লাম "তা হলে বিশ্বাস কর, তুমিই আমায় ডেকে এনেছ—না জেনে, না শুনে, না চিনে তুমিই আমায় ডেকে এনেছ। আমিও না জেনে, না শুনে, না চিনে তোমারই জন্যে এসেছি। কারণ তোমার মধ্যে যে ডেকেছে আমার মধ্যে সেই সে ডাক শুনেছে। যারে আমি সজ্ঞানে ডেকেছি সে আমার না পাওয়ার ধন; কিন্তু তুমিই আমার চিরকালের পাওয়ার ধন একথা কি বিশ্বাস করিতে পারিবে তুমি?"

হাসির মুখে সেই তার সহজ হাসি ফুটে উঠতেই বুঝতে পারলাম

সে বুঝুক না বুঝুক বিশ্বাস করেছে। তাই তার উত্তরের অপেক্ষা না করেই আমি তার পায়ের কাছে বসে আত্মনিবেদন করে বল্লাম "তবে আমায় নাও—নিয়ে, তার পর যত ইচ্ছা বেদনা দাও, আঘাত কর, কাঁদিয়ে দাও, গলিয়ে দাও কিন্তু সেই সঙ্গে আমি যে তোমারি এবং তোমারি হয়ে সবারি এইটেই আমায় সজোরে জানিয়ে দাও, আগুনের রেখায় প্রাণে দেগে দাও। দিতে পারবে হাসি ?"

জানিনা সে আমার কথা সম্পূর্ণ বুঝলে কিনা, কিন্তু তার চক্ষে যে পরম নির্ভরতার পরম বিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠল তাই দেখতে দেখতে আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। যেমন ভাবে নতজানু হয়ে উর্দ্ধমুখে তার দিকে চেয়েছিলাম তেমনি ভাবেই রহিলাম। উঠে দাঁড়ন আর হল না।

কতক্ষণ যে এভাবে ছিলাম তা জানিনা, কিন্তু যখন জ্ঞান হল, দেখলাম মা এসে দুজনার মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হাসি হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে "ছি ছি মা, তোমার এই সন্ন্যাসী ছেলেটি বড় নির্লজ্জ !"

মা কিন্তু আদর করে তাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বল্লেন, "আমার এই গিন্নী-মেয়েটীও ত নির্লজ্জতায় কম যায় না।"

হাসি এই বার মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে হাসতে লাগল —কিন্তু তার মুখ হতে যে মা মা ধ্বনি শুনতে পেয়ে ছিলাম, সেই ধ্বনি আমার মধ্যে কি ধ্বনি যে জাগাল তা সেই পরম জননীই শুনতে পেয়েছিলেন, আর কেউ নয়।

আমি তখনি সংসারের কাজে বেরিয়ে গেলাম কিন্তু সমস্ত সকালটা মাতালের মত কি যে করলাম তা জানিনে। দেওয়ানজী ব্যস্ত হয়ে বল্লেন, "ম্যানেজার বাবু বাড়ী যান, আপনার আজ শরীর

খারাপ হয়েছে। ছোট দিদিমণি বলে পাঠিয়েছেন যে আজ আপনাকে এখনি বাড়ী পাঠিয়ে দিতে হবে।"

আমি তবু উঠলাম না, কাগজপত্র খুলে চুপকরে চেয়ারের ওপর বসেই রইলাম। শেষে হঠাৎ অন্দর হতে আবার আদেশ এল, 'এখনি আমায় বাড়ী ফিরে যেতে হবে।'

আমি মনে করছিলাম, বুঝি এই কাজের মধ্যে আমাকে সম্পূর্ণ গোপন করে রাখতে পেরেছি। বুঝি আজও আমার সবই সেই চিরন্তন গোপনতার মধ্যে এখনো বসে আছে! ওরে মূর্খ, তা হবে কেন? আজ যে প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই জগৎচক্ষু আমার জীবনের দিক চক্রের ওপর উঠে পড়েছেন। এখন আমার ভূ ভূর্বঃ স্ব হতে সত্য পর্য্যন্ত সমস্তই সেই পরম সবিতার আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সত্য হয়ে উঠেছে। আর কি কিছু গোপন থাকে?

আমায় উঠতে হল; কিন্তু কি জানি কেন আমার এই অবাধ্য পা দুটো আমাকে সেই প্রচণ্ড রৌদ্রে, সেই আষাঢ় দিনের ভয়ঙ্কর উত্তাপের মধ্যদিয়ে আমার বন্ধুর দিকে নিয়ে চল্ল। আমি মনে করেছিলাম, যে সেই ভয়ঙ্কর আলোর মধ্যে আমায় বুঝি কেউ দেখতে পাবে না। কিন্তু যে চোখ একবার আমার জগতের উপর ফুটে উঠেছে, সে দুটী চোখ যে তার গবাক্ষ হতে আমারই পথের দিকে চেয়ে ছিল তা কি জানতাম আগে! জানলে কি আর মায়ের দিকে না গিয়ে বন্ধুর দিকে ঐ অবস্থায় চলে যেতাম?

কিন্তু আজ যে আমার সব পাওয়ার দিন! আজ যা পাবার তাকে পেলেই শুধু হবেনা, যা না-পাবার, যা সাধনার তাকেও যে না পাওয়া দিয়ে পেতে হবে! আজ কি আমি কেবল আমাতে আছি।

আজ যে আমার জন্য সারা জগতে সাড়া পড়ে গিয়েছিল—ষড়যন্ত্র হচ্ছিল! আমি কি করে ঠিক যেখানে যাওয়া উচিত হত সেখানে না গিয়ে অন্য কোথাও যাই।

বন্ধুর কাছে গিয়ে দেখি বন্ধু চুপ করে বসে আছে। যেন সেও কার অপেক্ষায় সমস্ত চিত্তকে একাগ্রকরে, ধ্যানস্থ হয়ে রয়েছে। যেন কে আসবে, এখনি আসবে—এখনি তার পূজা নিতে হবে। বন্ধু আমায় দেখে ছুটে এসে আমার বুকে পড়ল। আমি তাকে নিয়ে তার আসনেই বসলাম। আজ আর কোনো দ্বিধাই রহিল না।

সেও আমায় জড়িয়ে ধরে বল্লে, "তোমার মুখ দেখে বোধহচ্ছে, আজ তুমি কি যেন পরম বস্তু পেয়েছ এবং সেই বস্তু আমায় দিতে এসেছ।"

আমি বল্লাম "হ্যাঁ ভাই, তাই আজ আর কোনো গোপনতা কোনো লুকোচুরী নয়; শুধু আপনাকে উন্মুক্ত করে দেখান। কিন্তু তোমার মুখ দেখেও বুঝছি আজ তুমি কিছু গোপন করবে না।"

বন্ধু বল্লে "হ্যা আজ আর কোনো গোপনতা নয়—আর এ লুকোচুরী সইছে না আমার। আজ আমি নিজেকে সাবারই সামনে ধরে দিয়ে বলব, আমার মধ্যে যাকে চাচ্ছ সে আমি নই তবু সেই আমি। তোমরা যাকে চাচ্ছ তাকে তোমরাই আমার মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছ, আমি সেই হয়ে গিয়েছি। এই স্থূল দেহটা তার দেহ না বলতে পার। কিন্তু সেই পরম প্রার্থিত মানুষটী আমাতেই এসেছেন। জানি না, যাঁকে এঁরা এতকাল ধরে চাচ্ছেন তিনি এখন কোথায়; তবু একথাও সত্য যে, যে মহাপুরুষকে এই চির

তপস্বিনী চাচ্ছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী, তাই তিনি এই অধম আধারকেও কৃতার্থ করেছেন।”

আমি পরমানন্দে তাঁহাকে জড়িয়ে বল্লাম, “ঠিক বলছ ভাই সে তোমার মধ্যেও আছে ? ঠিক বলছ যে সে একটা স্থূল দেহ ধারণ করে কেবল একটা জায়গায় আবদ্ধ নেই ? সে তোমাতেও আছে ? বল আর একবার বল ?”

বন্ধু হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়াল—তার পর দুবার ঐ মস্ত ঘরখানার এপার ওপার ঘুরলে, তারপর সজোরে প্রায় চীৎকার করে বল্লে “আছে আছে নিশ্চয়ই আমাতে প্রবেশ করেছে, আমার সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। আমিই সেই—”

আমিও ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লাম “আমিই সেই আমিই সেই—আমিই সেই।” বন্ধু থমকে দাঁড়ালে আমার মুখখানা দুহাতের মধ্যে নিয়ে বল্লে “কে—কে—কে তুমি ?”

আমি আবার বল্লাম “আমিই সেই—আমিই তোমার মধ্যে আমি—আমিই আমার মধ্যে আমি—”

বন্ধু আমায় থামিয়ে বল্লে “কে তুমি ? তুমি কি সত্যানন্দ নও—তুমি কি তবে ? কে তবে তুমি ?”

তার ভীত আর্ত্ত স্বর শুনে আমরাও যেন চমক ভাঙ্গল ; আমি বল্লাম, “আজ গোপনতার দিন নয় ভাই, আজ সব লুকাচুরীর জাল ছিঁড়ে ফেলতে এসিছি। এস তোমায় বলছি।”

সে এতদিন যে কথা জানতে পারেনি, কেউ যে কথা ঘুণাক্ষরেও টের পায় নি, সেই গোপন কথা আমি তিন কথায় জানিয়ে দিয়ে বল্লাম, “ভাই আর গোপনতা নয়, তুমিও আপনাকে প্রকাশ করেছ, আমিও আমাকে প্রকাশ করলাম।

এখন এই সত্যকে স্বীকার কর। প্রাণপণ বলে একে বুকের মধ্যে টেনে নাও—তুমি আমি হয়ে যাও ; হয়ে গিয়ে, যিনি আমায় এতদিন ধরে তোমার মধ্যে পেতে চেষ্টা করছেন, সাধনা করছেন তাঁর পানে সেই আমাকে নিবেদন কর—তোমার বুকের মধ্যে বসে সেই সাধনার ধনকে চির অপ্রাপ্যকে পেয়ে ধন্য হই। বন্ধু, গুরু, শিষ্য, তুমি আমার কাছে হার স্বীকার করে, আমাকে তোমাকে তোমার অন্তরস্থ কর। আর নয় ভাই—আর মিথ্যা ভয়ের মধ্যে থেকো না। অভয়কে আশ্রয় কর।"

আমার কথা শেষ হতে না হতে বন্ধুর সর্ব্বশরীরে ভয়ানক কম্পন দেখা দিল ; দেখতে দেখতে তার সমস্ত শরীর যেন জ্বলে উঠল। মদন ভস্মের পূর্ব্বে বুঝি সেই মহাযোগীর দেহ এমনি ভাবে জ্বলে উঠেছিল—বুঝি সেই ভবনেত্রজন্মা অগ্নিও এই দুই চোখের আলোর মতই জ্বলে উঠেছিল। সন্ন্যাসী হঠাৎ একেবারে তাঁর তুরীয় দেশে চলে গিয়ে দহরাকাশ হতে বজ্রবিদ্যুৎ বর্ষণ করে বল্লেন, "নেহি—নেহি—নেহি ম্যায় নেই চাহ্‌তো হুঁ, কুচ নেই চাহ্‌তা হুঁ ;

অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো
বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়ানাম্।
নবা বন্ধনং নৈব মুক্তি র্ন ভীতি
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহং শিবোহহং ॥

আমি তাঁর হাত ধরতে গেলাম—তিনি আমার হাত ছুড়ে ফেলে দিয়ে বল্লেন "চুপ কর তুমি, সরে যাও তুমি, আমি হারিনি। তুমি সত্য হতে পার কিন্তু আমিও অসত্য নই। তুমি কেবল জয়লাভ করবে—আমারও কি জয় হবে না? সহজই জিতবে

আর সাধনাই হারবে? না তা কিছুতেই হবে না। এই জয়লাভ করলাম, আমি কেবল তোমার যন্ত্র নই, আধার নই, আমি তোমার প্রভু! তোমার স্বামী, তোমার তুরিয়ানন্দ!"

আমি কিন্তু ভয় পেলাম না—ভয়? তখন আমিও যে তুরিয়ানন্দে—তাই হেসে বল্লাম, "তুমিই ত আমার প্রভু।" কিন্তু তুরিয়ানন্দ বল্লেন, "না—না—আমি আর কোনো কথা শুনব না, তুমি সরে যাও, আমিও এই চল্লাম। তোমার জয় হয়েছে কিন্তু আমিও হারিনি হারতে পারি না।"

"শিবোহং শিবোহং" ধ্বনি করতে করতে সেই মহা ত্যাগী সন্ন্যাসী বেরিয়ে গেলেন। আমি অবাক হয়ে তাঁর সেই গতিশীল মূর্ত্তির দিকে চেয়ে সেই আসনের উপরেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ধীরে ধীরে দিনের উজ্জ্বল জ্যোতির মধ্যে তাঁর দেহ মিলিয়ে গেল।

হঠাৎ একটা অস্ফুট কাতর ধ্বনিতে আমি ফিরে চেয়ে দেখি আমার পশ্চাতের দরজার চৌকাঠের উপর কে ঐ লুটুচ্ছে। ও কে? ও যে আমার হাসি! আমি ছুটে গিয়ে তাড়াতাড়ি তাকে তুলতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু সে উঠলে না, শুধু উপুড় হয়ে পড়ে চীৎকার করে বল্লে "নিষ্ঠুর—নিষ্ঠুর—মিথ্যাবাদী।—"

আমি বসে পড়ে বল্লাম "না হাসি না, আমি মিথ্যাবাদী নই। আমি সত্যই বলিছি, কিন্তু তুমি আমায় বিশ্বাস করতে পারলে না, বুঝতে পারলে না, এইটাই দুঃখ। কিন্তু তুমি যদি বিশ্বাস না কর তাহলে আমার সবই বিফল।"

হাসি একবার মুখ তুলে আমার দিকে চাইলে, তারপর আবার মুখ লুকিয়ে বল্লে "কি করে বিশ্বাস করব তোমায়? যে এতবড়

একটা ব্যাপার এতদিন গোপন করে রাখতে পেরেছিল, তাকে কি করে, বিশ্বাস করব।"

আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হ'তে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল—হায়রে সহজিয়া! তোকে ত' কেউ চায় না, কেউ চাইতে পারে না। যা অসহজ, যাকে বিশ্বাস করতে মাথামুড় খুঁড়তে হয়, যে বিশ্বাস করাটা চেষ্টা করে শিখতে হয়, সেই বিশ্বাসের উপর মানুষ নির্ভর করতে পারে। আর যে বিশ্বাস অন্তরাত্মা থেকে সহজে উঠ্ছে, সেটার উপরে কেউ নির্ভরই করতে পারে না। আমার হাসি যতদিন—যতক্ষণ সহজ অবস্থায় ছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে কত না সহজে আমাকে বিশ্বাস করে অন্তরে স্থান দিয়েছিল। কিন্তু যেই তার মধ্যে ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের ভাব জেগে উঠল অমনি সে অসহজ হয়ে গেল। না গো না কেউ এই সহজ ধর্ম্ম বুঝবে না।

এই যে সন্ন্যাসী এতদিন এখানে আমারই আসনে, আমাকেই বুকে নিয়ে বসেছিল সেই সন্ন্যাসীর মধ্যে এরা আমায় বিশ্বাস করেছিল, আমায় পেয়েছে বলে ধরে নিয়েছিল; কিন্তু এই বিশ্বাস কি সহজের, না চেষ্টা করে আনা? এই বিশ্বাসের জন্য এদের কত না চেষ্টা করতে হয়েছে, কারণ ঐ মহাত্যাগীর মধ্যে আমাকে পেতে হলে যে না পাওয়া দিয়ে পেতে হবে তুরিয়ে গিয়ে পেতে হবে। সে পাওয়া ত সহজ নয়, তাই সে পাওয়া আজ না পাওয়ার মধ্যে মিলিয়ে গেল। আর এই যে আমি সহজে ধরা দিয়েছি এ যে একেবারে পাওয়ার বস্তু, তাই এই অসহজের মানুষরা আমায় গ্রহণ করতে পারছে না। বুঝি এখন সহজ হতে হলে আবার উল্টো সাধনা করতে হবে—অস্তিত্বকে উল্টো

পাকে ঘোরাতে হবে। আমায় চুপ করে থাকতে দেখে হাসি উঠে বসল। তারপর প্রশ্ন ভরা অশ্রুআর্দ্র চক্ষে ভীতভাবে আবার জিজ্ঞাসা করলে, "বল, তোমার কি করে বিশ্বাস করব।"

আমি উদাস চক্ষে চেয়ে বল্লাম, "সহজে যদি বিশ্বাস করতে না পার, তোমার মধ্যে যে আছে যদি তার কথায় বিশ্বাস না হয়, ত' আমি হাজার বল্লেও বিশ্বাস করবে না। তুমি যখন সহজেই আমার বিশ্বাস করে ছিলে তখনি আমায় পেয়েছিলে। সে বিশ্বাস তোমায় শিখতে হয় নি তার জন্য সাধনা করতে হয় নি তার জন্য তপস্যা করতে হয় নি। তাই আমাদের সে মিলন—পূর্ণ হয়েছিল আনন্দের হয়েছিল। কিন্তু এখন তুমি সে মিলনকে অসহজের অবিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে ছেঁকে নিতে চাও—তা হবে না। আমি কিন্তু সহজেই তোমায় পেয়েছি, সহজেই তোমার হয়েছি। যিনি আমায় সাধনা করে তপস্যা করে পেতে চাচ্ছিলেন তাঁকে আমি তপস্যার মধ্যে দিয়ে পেয়েছি—না পাওয়ার মধ্যে দিয়ে পেয়েছি। তাই আমার মধ্যে দুইটাই সত্য হয়ে উঠেছে। এ যে কি রকম সত্য তা যে বোঝাতে পারলাম না—বুঝি বোঝান যায় না। না যায় না যাক তবু এইটেই সত্য, যে, পাওয়ার ধন পাওয়া দিয়েই পেতে হবে এবং না পাওয়ার ধন না পাওয়া দিয়েই পেতে হবে, চির সাধনা, চির তপস্যা, চির বিরহ দিয়েই পেতে হবে। এই মহাসত্য এই মহামুহূর্ত্তে আমার জীবনে সত্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু তুমি তা বুঝবে কি? বুঝবে কি, যে ঐ যে সন্ন্যাসী এই আসনের উপর এতদিন বসে ছিলেন ওরই মধ্যে আমিই ছিলাম, ওরই মধ্যে আমি আমার চিরবিরহের পাওয়াকে চির ত্যাগের পাওয়াকে সত্য করেছি। আর এই যে আমি স্থূলদেহ

হয়ে, নিতান্তই ধরা ছোঁয়ার জিনিষ হয়ে চির পাওয়ার ধন তোমাকে পেয়েছি নিতান্তই ধরে ছুঁয়ে পেয়েছি এর মধ্যেও আমি সত্যকেই পেয়েছি। আমার এই সব কথা এখন হয় তো বুঝতে পারবে না, কিন্তু যদি কোনোদিন তোমার মধ্যকার সহজ মানুষটীর সঙ্গে পরিচয় হয়, তা হলে ধরতে পারবে বুঝতে পারবে যে, এই সহজে যে তোমার দুখানি হাতের মধ্যে নিজেকে ধরা দিয়েছে, তাকেই তোমরা ঐ সন্ন্যাসীর মধ্যে খুঁজেছ—হয়ত পেয়েও ছিলে—কিন্তু কোনোখানেই তোমরা আমায় বিশ্বাস করে নিতে পারলে না।"

আমার এই দীর্ঘ বক্তৃতা শুনতে শুনতে হাসি যেন অভিভূতের মতই হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু আমার শেষ কথাকটা শেষ হবার পূর্ব্বেই সে নিশ্বাস ফেলে, নড়ে চড়ে, তারপরে বল্লে, "না—না আমি ত' সন্ন্যাসীকে চাই নি, ঐ আসনে যিনি ছিলেন তিনি আমার কেউ নন। সন্ন্যাসীকে যিনি আজন্ম চেয়ে আসছেন, তিনি ঐ দেখ কাঠের মত দাঁড়িয়ে তোমার এই সব হেঁয়ালীর কথা শুনছেন। জানি নে উনি বুঝতে পেরেছেন কি না। কিন্তু আমায় যে না বুঝেও বুঝতে হচ্ছে, তুমি যে আমার সব বোঝার ওপরে উঠে গেছ। দিদি—"

আমি চেয়ে দেখলাম—কি দেখলাম! দেখলাম আমার সেই চির মৌনতার, চির সাধনার, চিরকালের না-পাওয়ার ধন, চিরবিরহের ব্যবধানের পারে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পার্শ্বেও বোধ হ'ল সেই মূক মেয়েটী, যারে আমি সেই প্রথম পরিচয়ের দিনে এদের কাছে দিয়ে গিয়েছিলাম, সেই বাক্যহারা মানুষটীও কি যেন বলবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু বলতে পারছে না।

হাসির ডাকে সেই মৌন প্রতিমার যেন চমক্ ভাঙ্গল।

তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বল্লেন, "হাঁ ভাই আমি সন্ন্যাসীকেই চেয়েছিলাম, তাই তাঁকে পেয়েছি।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, "আমি যাকে পাবার জন্য এই আসন পেতে, সেই আসনের তলে আমাকে সমাহিত করে রেখেছিলাম সে আপনি নন—"

আমি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালাম, কি যে বলতে যাচ্ছিলাম তা স্মরণ নেই, তবে এইটুকু মনে আছে যে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা চীৎকার করে বলতে যাচ্ছিল, সেই আমি—সেই আমি—ওগো আমি সেই। কিন্তু আমার অন্তরের কথা আর এক চিরমৌন আবরণ ভেদ করে বেরুল, মহাদুঃখে মহাবেদনায় যে মূক হয়ে গিয়েছিল বাক্য হারিয়েছিল, সেই অকাল মূক মানুষটী চীৎকার করে বলে উঠল—আপন সহজ ভাষায় বলে উঠল—"নেহি—নেহি—সোহি হায়, ইয়ে সোহি হায়।"

হাসি উর্ম্মিলা দুজনেই ভয়ানক চমকে উঠল। উর্ম্মিলা ক্ষণকাল সেই উন্মত্তপ্রায় মানুষটীর দিকে চেয়ে তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে, "কথা কইলি বোন, এতদিন পরে কি তুই কথা খুঁজে পেলি? আঃ বাঁচলাম। হ্যাঁ ইনি তিনিই, ভয় নেই আমি একবারও অবিশ্বাস করি নি।" তারপর আমার দিকে ফিরে বল্লেন, "তবু আপনি তিনি নন, আমি এই আপনাকে কখনো চাই নি, আমি যারে চেয়েছিলাম সে হয়ত নেই! নেই? না না তা কেন? সে হয়ত কেবল আমার অন্তরেই আছে আর কোথাও নেই। কোথাও কখনো ছিল না। কিন্তু আমি তা আগে জানতে পারি নি। জানলে হয়ত তাকে পাবার জন্য এমন করে বাইরে আসন পাততাম না। সে যে বাইরে পাবার নয়—সে যে—"

বলতে বলতে উর্ম্মিলা দেবী এমন ভয়ঙ্কর কাঁপতে লাগলেন যে দেখে আমার ভয়ানক ইচ্ছা হল যে বলি 'ওগো, আমি সেই, তুমি আমায় বিশ্বাস কর।' কিন্তু সে কথাও আমায় বলতে হল না। হাসি চকিতে উর্ম্মিলার পাশে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বল্লে—"না দিদি না এ যে সেই—এ যে তোমারই সেই চির সাধনার ধন। একে এর বেশ দেখে অবিশ্বাস ক'র না।"

উর্ম্মিলা দেবীর পা থেকে মাথা অবধি হঠাৎ ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি সতেজে বলে উঠলেন "অবিশ্বাস! তবে এতদিন ধরে এই মহামানুষটীর কাছে তুই ছিলি কি করে? একে অবিশ্বাস করব এতখানি শক্তি আমার নেই হাসি। আমি যখন এসে দেখলাম, এই মহাপুরুষের বুকের ভেতর সেই মহাত্যাগী মহাজ্ঞানী মানুষটীও ছোট্ট হয়ে, শিশুর মত পরম নির্ভয়ে আশ্রয় নিয়েছেন তখন হতেই যে আমার সব অবিশ্বাস চলে গিয়েছে। তারপর যখন সবই শুনলাম তখন আর অবিশ্বাস কোথায় থাকবে, কোথায় থাকতে পারে? অবিশ্বাসের স্থান আর নেই, হাসি,—সে যদি থাকত তাহলে কি এতদিন পরে এই মুক মানুষটী কথা ফিরে পেত? অবিশ্বাসকে আমরা গড়ে তুলি। অবিশ্বাস গড়ে ওঠে। বিশ্বাস সহজেই জন্মায় জন্মের সঙ্গে জন্মায়। না, আর আমার মধ্যে অবিশ্বাস নেই। কিন্তু আমি বলছি আমি এঁকে চাই না কথনো চাই নি। জন্ম হতে চাইতে শিখিও নি, জন্ম হতে এঁকে সহজে চাইও নি। আমি যারে চাই তাকে সহজে পাওয়া যায় না। বুঝলাম, তাকে পাওয়া চিরদিনই না-পাওয়া।"

হাসি এইবার হেসে উঠল—কিন্তু সে হাসি প্রায় কান্নারই মত সেই চির ক্রন্দনের কক্ষে, চির বিরহ সাধনার কক্ষে ধ্বনিত

হল। হাসি হেসে বল্লে, "মিথ্যে কথা, আমি তোমাদের ও হেঁয়ালির কথা বুঝি নে—বুঝতে চাই নে।"

উর্ম্মিলা তার হাত দুটো চেপে ধরে আমার হাতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্লেন, "তুমি বুঝোনা বোন, তোমার না বোঝাই সার্থক হোক, তুমি এমনি করে চিরদিন যেন এঁকেই পাও।"

কিন্তু হাসি হঠাৎ তার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উর্ম্মিলাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে, "না—দিদি না, এই যে তোমার চির সাধনার ধন, একে এমন করে পায়ে ঠেল না। তুমি যদি না একে বেঁধে রাখ তা হ'লে কে এই মহাসন্ন্যাসীকে বেঁধে রাখবে? তুমি কি বুঝতে পারছ না যে ইনি বাইবে যাই সাজুন অন্তরে সেই তোমার চির সাধনার সন্ন্যাসী—আর কিছুই নন।"

উর্ম্মিলা আবার আমার দিকে ফিরলেন, তারপর তাঁর বিশাল নয়ন দুটী আমার মুখের ওপর একাগ্র করে বল্লেন, "আমি সেই সন্ন্যাসীকেই পেয়েছি—বল তুমি, আমার সে সাধনা কি অসিদ্ধ হয়েছে? তোমায় কি আমি পাই নি? বল তুমি, তুমিও কি আমায় পাও নি?"

হায় দেবি! তোমায় যদি না পেয়েছি তাহ'লে কি করে এই জগতে এতদিন জেগে আছি? কে আমায় চিরদিন বেদনা দিয়ে আঘাত দিয়ে জাগিয়ে রেখেছে। সে যে তুমি, চিরদুঃখরূপিণী, চিরআশারূপিণী, চিরবিরহরূপিণী, চির প্রতীক্ষারূপিণী তুমিই যে আমার সেই চির সঙ্গিনী। যাকে পাবার জন্য বেরিয়েছিলাম, যাকে পাবার জন্য সাগর ভূধর প্রান্তর নগর সর্ব্বত্র খুঁজেছি, সেই পরম দুঃখই যে তুমি। তাকে বাইরে পাই নি, কারণ বাইরে যে আছে সে যে এই হাসি। সে ত দুঃখ নয় বেদনা নয়। যে বেদনায় ফুল ফুটছে,

বাতাস বইছে, তারা নক্ষত্র সূর্য্য চন্দ্র সবই ছুটছে সেই পরম গতিরূপিণী, অশান্তিরূপিণী তুমিই যে! তোমায় ত কেউ চায় না—চাইতে পারেই না যে। চায় যাকে, সে হচ্চে এই আমার চির সুখময়ী চির মিলনময়ী হাসি। কিন্তু তুমিই আমার জগতের না—চাওয়ার ধন, তুমিই আমার জগতের চিরন্তন দুঃখ! তাই তুমি অসহজ—তাই তোমায় সহজের মধ্যে পেতে যাওয়া ভুল—আমি সহজের মানুষ হয়ে তোমায় সে ভাবে চাইব কেন? পাবই বা কেন? আমি সহজিয়া, তাই তোমায় চিরন্তন অফুরন্ত না-পাওয়ার মধ্যে পেলাম, পাওয়ার মধ্যে চাইতে পারব না গো পারব না।

আমি এত কথা এমন করে তাকে বলতে পারি নি, তবু যা বলেছিলাম তাতেই সে বুঝেছিল, বিশ্বাস করেছিল; তাই সে আমার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ হাসির হাত দুটো আমার হাতের মধ্যে চেপে ধরে বল্লে, "তুমি—তুমি—ওগো আমার চির দুঃখ তোমায় এই সুখময়ী হাসির মধ্যে ত্যাগ করে পেলাম—পেলাম—পেলাম। আমিও তোমারি—তোমারি—।"

তারপর সেই মহাযোগিনীর দুটী বিশাল চক্ষু আমার মুখের ওপর তার সমস্ত বেদনা নিয়ে, বিরহ নিয়ে, সাধনা নিয়ে চিরদিনের জন্য লয় হয়ে গেল। হাসি ভীত ভাবে ডাকলে "দিদি।" কিন্তু কে উত্তর দেবে? সেই মুক বালিকা তার নবলব্ধ বাকশক্তিকে যথাসাধ্য সজোরে ব্যবহার করলে, কিন্তু যে সব উত্তর প্রত্যুত্তরের বাইরে, সব বিশ্বাস অবিশ্বাসের উর্দ্ধে সত্যলোকে চলে গিয়েছে তাকে কে ডেকে আনবে?

আমি সেই সমাধিস্থ দেহকে ধীরে ধীরে তারই পাতা আসনের ওপর শুইয়ে দিলাম। তারপর সেই অপরূপ অপলক নয়ন দুটীর

মধ্যে চেয়ে চেয়ে ডুবে গেলাম। হাসি ও অপলক দৃষ্টিতে সেই মুখের দিকে চেয়ে রইল—ত্রিবেণীসঙ্গম পূর্ণ হয়ে গেল। যোগমগ্ন নয়নের মধ্যে ঐ সরস্বতীর গুপ্তস্রোতে আমার অস্তিত্বের ঐ গঙ্গা আর হাসির প্রেম যমুনা, যুক্তও হল, মুক্তও হল।

হয়ত আমাদের এই ত্রিবেণী-সঙ্গম কেউ দয়ঙ্গম করতে পারবে না। হয়ত বলবে, যে, 'এত কথার কি দরকার ছিল? সোজা বল্লেই হ'ত যে উর্ম্মিলা দেবী যখন জানতে পারলেন যে তুরিয়ানন্দ তাঁর স্বামী নয়, তখন সেই সতী লক্ষ্মী এমন আঘাত পেলেন যে সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যু হল।' কিন্তু আমি বলব—না তা নয়, আমার জানকী তাঁর রঘুনাথকে পেয়েছেন চিরদিনই পেয়েছেন। ঐ ত্যাগীর মধ্যেও পেয়েছেন এবং আজ এই ভোগীর মধ্যে আমার মধ্যেও পেলেন। আমার অস্তিত্ব যেমন সত্য তাঁর অস্তিত্বও আমার কাছে তেমনি সত্য। স্থূলরূপিণী মিলনরূপিণী সহজরূপিণী হাসি, আমার যেমন সুখের দিক, সেই বিরহরূপিণী দুঃখরূপিণী চিরসাধনারূপিণী উর্ম্মিলাও আমার অস্তিত্বের আর এক দিক—দুঃখের দিক। আমার অস্তিত্বের দুই পিঠ বা পীঠ রূপে তারা আমাতেই আছে, আমাকেই পেয়েছে। আমিই তাদের দুজনকে ধরে চিরন্তন অস্তিত্বরূপে অখণ্ড হয়ে আছি। এক সঙ্গে এই অস্তিনাস্তিকে সুখদুঃখকে স্বীকার করাই সহজ দর্শন। একই কেন্দ্রে এই দুইকে স্বীকার না করাই ভুল, মায়া মিথ্যা। কেবল সুখকে চাইলে সুখ থাকে না, ছুটে পালায়। আর কেবল দুঃখকে ত' কেউ চায়ই না—কিন্তু আমি জানি মানুষ অন্তরে অন্তরে এই দুটোকেই চায় এবং এক সঙ্গেই চায়। দোষের মধ্যে এইটুকু, যে, সে জানে না যে, সে এক সঙ্গে এবং সহজেই

এই দুটোকে চাচ্ছে। এই অজ্ঞানই তাকে এই পরম অদ্বৈতের আনন্দ হতে বঞ্চিত করেছে। এই দ্বৈতকে ধরেই যে তার অখণ্ডানন্দের অদ্বৈত অস্তিত্ব, এইটাই জানে না বলে সে গতির মধ্যে, চঞ্চলের মধ্যে স্থির হতে পারে না, তাই আনন্দের হাটে এসে কেবল নিরানন্দকেই কিনে বেড়ায়।

ত্রিবেণী সঙ্গমে লুপ্ত না হয়ে, কেবল গুপ্ত হয়ে সেই সরস্বতী ধারা চিরতরে রয়ে গিয়েছে। সেই আসনে আর কাউকে কেউ দেখতে পায় না বটে, কিন্তু আমি জানি আর আমার সহজের ধন হাসিও জানে, যে, সে আছে তাই আমি আছি, হাসি আছে, জগৎ আছে! সে আছে তাই আলো আছে অন্ধকার আছে, সুখ আছে দুখঃ আছে, জ্ঞান আছে অজ্ঞান আছে, ধর্ম্ম আছে অধর্ম্ম আছে; সে আছে তাই এই সারা বিশ্ব তার সমস্ত-স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ তুরিয় নিয়ে নিয়তই আছে। তোমরা তাকে না দেখতেপাও নাই বা পেলে, কিন্তু ঠিক জেনো যে সেই মহা বিরহ-মিলনের দিনে সে আমারি মাঝে মহাত্যাগ-যোগের দ্বারা আপনাকে লয় করেছে কিন্তু বিলয় করেনি। সে দিন সেই মহাত্যাগের দ্বারা মহাভোগের মধ্যে অচল অথচ সচল হয়ে জীবনের জীবন, মনের মন, আত্মার আনন্দরূপে হাসি এবং আমার মাঝে সে আছে—আছে—আছে।

আনন্দের দুই পিঠ—সুখ এবং দুঃখ, মিলন এবং বিরহ। আমারও দুই পীঠ হাসি ও উর্ম্মিলা। এককন ব্যক্ত আর একজন অব্যক্ত। এই দুজনকে ধরেই আমার **অখণ্ডানন্দের** অস্তিত্ব। আমি সেই আনন্দে ডুবে আছি ভাই! তোমরা আশীর্ব্বাদ কর ভাই, যেন সেই অখণ্ডানন্দেই ডুবে থাকি।

ওঁ অখণ্ডানন্দার্পণমস্তু।

শুদ্ধি পত্র

পত্রাঙ্ক	ছত্রাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১		প্রিয়ব্রতের	সন্ন্যাসীর
২	১৩	তাহলে দুঃখই	তাহলে বুঝবে দুঃখই
২	২৪	মায়ার	মায়ের
৩	১	কারো	তার
৩	১০	তাঁরা	(উঠাইয়া দিতে হইবে)
৫	৬	কিন্তু সেই	কিন্তু কে সেই
ঐ	১৯	তোমায় পাওয়া	তোমায় না-পাওয়া
৬	২	আমি জেগে	আমি যে জেগে
৬	৩	মধ্যে জেগে	মধ্যেই যে জেগে
৬	২৩	কণ্ঠটাই	কথাটাই
১৪	২২	কুত্রাবিৎ	কুত্রচিৎ
২৩	২	পিছলেই	পিছ্লুলেই
২৪	১৬	সাহায্য চাচ্ছেন	[উঠাইয়া দিতে হইবে
২৫	২৩	এই স্বীকার	এই সত্য স্বীকার
২৭	১০	বড	জড়
ঐ	ঐ	গবক্ষ	গবাক্ষ
ঐ	২১	অপমমৃতং	রূপমমৃতং
২৯	২০	শুব্ধ	শুদ্ধ
৩৪	১৮	মোহায়া	মোহায়
৩৭	৮	এই টাই	এইটারই জন্য
৪০	৪	চিরদিনই	কিন্তু চিরদিনই

পত্রাঙ্ক	ছত্রাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৫	৪	অবব্রী	মব্রবী
ঐ	৮	পাঁচ হতে	পাঁচ কাণ হতে
ঐ	২২	ছোট বেলা কৈ	ছোট বেলা হতে কৈ
৪৯	১০	সঙ্গোপন ভোগ	সঙ্গোপভোগ
৫৪	৬	এই বড়	এই এত বড়
৫৬	২	তথন আনন্দ	তথন তুমিও আনন্দ
ঐ	৩	তথন আমার	আর তথন আমার
৬৮	৩	গেলাম, কি	গেলাম, কিন্তু কি
৭০	১৭	আমার চিরমুক্তি	এই আশাই আমার চিরমুক্তি
৭৪	১৭	অন্তর—বেরিয়েছিলাম	অন্তর হতে বেরিয়েছিলাম
৭৫	১৫	কি আনন্দ	কি আনন্দে আমায়
৭৬	১৭	হাত রেখে বল্লেন	হাত রেখে সন্ন্যাসীকে বল্লেন
৭৭	২৪	অদ্ভূৎ মানুষ	ঐ অদ্ভূত মানুষ
৭৮	৮	যার আজকের	যার কাছে আজকের
১০১	৮	প্রাণ নিয়ে	প্রাণ হতে প্রাণ নিয়ে
১০৯	৮	এ	(উঠাইয়া দিতে হইবে)
১১১	১০	বামুনের	বামুন কে
১২০	১৯	তোমার	তোমরা
১৪৩	৩	মরার	মড়ার
১৫৪	৪	পানে	পায়ে

অন্য গ্রন্থ

শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট প্রণীত

১। স্বেচ্ছাচারী। মূল্য ১॥০ টাকা।

২। চিরন্তনী (নাটক)।

৩। দুইদেশী।

৪। আশা—একে একে বাহির হইতেছে।

শ্রীনিরুপমা দেবী প্রণীত গ্রন্থাবলী

১।	দিদি	২।০
২।	অন্নপূর্ণার মন্দির	১৸০
৩।	শ্যামলী	১॥০
৪।	বিধিলিপি	২৲
৫।	আলেয়া	॥০
৬।	বন্ধু	১॥০

উভয়ের রচিত

অষ্টক মূল্য ১॥০

প্রাপ্তিস্থান।

গুরুদাস চাটার্জ্জী, ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিণ্ডিকেট,

রায় এম্ সি সরকার বাহাদুর, ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস প্রভৃতি প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

১১নং কলেজ স্কোয়ার ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল সিণ্ডিকেট
প্রকাশিত :—

শ্রীশরদিন্দু রায় প্রণীত
সমানে সমান (গীতিনাট্য) মূল্য ।৵০ আনা
হিমালয় সঙ্গীত (যন্ত্রস্থ)

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় লিখিত নূতন কবিতার বই
ভৈরবী (যন্ত্রস্থ) মনের মানিক—গদ্যকাব্য (যন্ত্রস্থ)

আমাদের—
গৃহশিল্প গ্রন্থমালা—
১। তসর প্রসঙ্গ (প্রথম ভাগ) মূল্য ৵০ আনা
শ্রীগোপেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ প্রণীত

আমাদের—কর্ম্মপথে গ্রন্থমালা—

১। দরিদ্রের আহ্বান
(২য় সং) মূল্য ৵০ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

২। গাঁয়ের কথা
(২য় সং) মূল্য ৵০ শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

৩। যুগসমস্যা
(২য় সং) মূল্য ৵০ শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত।

৪। অকাজের কাজ (গল্প)
মূল্য ৵০ শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট।

৫। পল্লীস্বরাজ
মূল্য ৵০ শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায়।

৬। মায়ের ডাক (কথা নাট্য)
মূল্য ৵০ শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

৭। সেবা ও সেবক
মূল্য ৵০ শ্রীহরিপ্রসাদ মল্লিক।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত
পল্লীব্যথা
দুঃখ দৈন্যময় পল্লীজীবনের করুণ চিত্র। মূল্য ১৲ টাকা।
আমাদের কাছে পাইবেন।